KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫, সরকার্স মার্কেট লেন, কলকাতা-১৭
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভব (BIVAV)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : 1/1 1/2-3 1/4 2/1	Year of Publication : July - Sep 1976 Jan - March 1977 Apr - Jun 1977 July - Sep 1977
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : মনীষ বক্সী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

২

বিভাব

বিভাব

সম্পাদক/মণীশ নন্দী

WEST BENGAL

A dreamland of Handicrafts

Dhokra • Ivory • Horn • Shell Horn-wood Inlay Items • Bamboo • Wood-Carving • Stone Carving • Costume Jewellary • Hill Crafts • Filigree • Artistic Leather Items.

Contact :

EXPORT CELL

Directorate of Cottage and Small-Scale Industries

N. S. Bldges (9th floor) Calcutta-1

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র * কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সাময়িক পত্র পাঠাগার ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত-১৯৭

সূচীপত্র

বিভাব

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বিশেষ যুগ্ম সংখ্যা

১৩৮৩

প্রবন্ধ

বন্দে মাতরম্ নয়, নমস্ততে । নিত্যপ্রিয় ঘোষ ১৭

প্রবাদ প্রসঙ্গ । সুধীর করণ ৩৭

কবিতাগুচ্ছ

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের কবিতা । পার্থসারথি চৌধুরী ৫২

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের একগুচ্ছ নতুন কবিতা । ৫৮

পুরাতনী

রামকৃষ্ণ পরমহংস ও শশধর তর্কচূড়ামণি ঃ
পুনর্মুদ্রণ ও আলোচনা । অলোক রায় ৬৪

শিল্পভাবনা

ঋত্বিক ঘটকের ওপরে বিশেষ নিবন্ধ
‘একটা কিছু করতে হবে তো’ । সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৮

প্রবন্ধ

কলকাতার জলছবি । শিবপ্রসাদ সমাদ্দার ৮৮

কবিতাগুচ্ছ

শামশের আনোয়ারের কবিতা । দেবাশিস বন্দোপাধ্যায় ১০০

শামশের আনোয়ারের একগুচ্ছ নতুন কবিতা । ১০৭

বিদেশী সাহিত্য

প্রবাসে পরিহাসে একা : সল বেলো । বরুণ চৌধুরী ১১৩

চিঠিপত্র

চিঠিপত্র ১২৫

সম্পাদক
মণীশ নন্দী

সম্পাদকমণ্ডলী : পবিত্র সরকার । সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় । বিকাশ নন্দী । কবিরুল ইসলাম ।

সম্পাদকীয় দপ্তর : ৫/১ সি, ওল্ড বালীগঞ্জ রোড । কলিকাতা—৭০০০১৯

প্রচ্ছদ : শঙ্কর ঘোষ

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক ৬, সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলকাতা—৭০০০১৭ থেকে প্রকাশিত এবং রাজধানী প্রিন্টিং, ১১৭/১ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা—৭০০০১২ থেকে মুদ্রিত ।

সম্পাদকীয়

এই সংখ্যা প্রকাশে বেশ একটু দেরী হ'য়ে গেল । প্রতি বছরই এ সময় কলকাতার প্রেসগুলির ব্যবহার রহস্যময় হয়ে ওঠে । রহস্যের কারণ অবশ্য মোটামুটি আমরা জানি, কিন্তু জানিনা কি কার্যকারণ সম্পর্কে শিক্ষাবিভাগ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন, মুদ্রন ও প্রকাশন ব্যাপারটি জড়িত ! বছরের একেবারে শেষেই কি শিক্ষাবিভাগ বই অনু-মোদন করে পাঠান ? নতুন বছরে বই কেনার ভীড় স্বাভাবিক, কিন্তু ছাপা কেন আগেই হয়ে থাকবে না ! এর উত্তর কে দেবে ? হয়তো এই কারণেই পাঠ্যপুস্তকগুলিতে এত মুদ্রনপ্রমাদ, এত ত্রুটিপূর্ণ তৃতীয় শ্রেণীর রচনার ছাত্রসন্ত্রাস নৈরাজ্য । বছর বছর নির্বিবাদে চলছে এই একই ঊর্দ্ধশ্বাস দায় সমাপ্তির কাণ্ড ।

এ ছাড়া আমাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি ত্রুটিও স্মরণীয় । বিভাব সম্পর্কে আমাদের ধ্যান ধারণা আমরা প্রথম সংখ্যায় জানিয়েছিলাম, কিন্তু একটি পরিণতমনস্ক কাগজের পরিকল্পনার আগে আমাদের অন্তত তিনটি সংখ্যার লেখা হাতে নিয়ে কাজ সুরু করা উচিত ছিল, ইচ্ছা থাকলেও তা আমরা করে উঠতে পারিনি । কেউ কেউ লেখা দিতে নিদারুণ দেরী করেছেন । নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দিয়েও লেখা শেষ করে উঠতে পারেননি অনেকে । যাই হোক, গ্রাহকরা এক সংখ্যা কাগজ বেশী পাবেন । আশা করছি আগামী সংখ্যা থেকে যথাসময়ে বিভাব প্রকাশিত হ'বে । প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে

আমরা যা সাড়া পেয়েছি তা আশাতীত। আমরা গ্রাহক ও পাঠকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় অভিভূত ও কৃতজ্ঞ। যথাসময়ে লেখা না পাওয়ার জন্য পুস্তক আলোচনা এবং পুনর্বিবেচনা বিভাগটি এবার গেল না। ভাল লেখা না পেলে অবশ্য সব সংখ্যায় প্রতিটি বিভাগীয় রচনা প্রকাশিত নাও হ'তে পারে।

এবারে সাহিত্যের জন্য একাডেমী পুরস্কার পেয়েছেন রবীন্দ্রপ্রাণা শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী। আমরা আনন্দিত, সাম্প্রতিককালের বাংলা সাহিত্যে "ন হন্যতে" সত্যিই একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

আর ক'দিন পরেই লোকসভার নির্বাচন। আমরা কামনা করবো এই নির্বাচন যেন নায্য ও শান্তিপূর্ণ হয় এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে গণতন্ত্রের সমস্ত চরিত্রলক্ষণ বজায় নির্বাচনের পরেও থাকে। গণতন্ত্র একটি মহান শব্দ, ভুল ও শুধুমাত্র মৌখিক প্রোয়জনসাপেক্ষ উচ্চারণে তা যেন না সীমাবদ্ধ থাকে, দল মত নির্বিশেষে প্রত্যেক নির্বাচিত লোকসভার প্রতিনিধিদের কাছে সেটাই একমাত্র প্রার্থনা।

বর্তমান সংখ্যায় লেখকদের ব্যক্তিগত বানান প্রবণতাই বজায় রাখা হ'ল।

প্রবন্ধ

বন্দে মাতরম্ নয়, নমস্তুতে

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

বাঙলাদেশের জাতীয় জীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্' সংগীত কবে প্রবলভাবে এল, সে বিষয়ে 'বঙ্কিম-জীবনী' প্রণেতা শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৯১৩ সালের এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা থেকে উদ্ধার করেছেন এই কথাগুলো :

During Bankim Chandra's lifetime the *Bande Mataram*, though its dangerous tendency was recognised, was not used as a party war-cry ; it was not raised, for instance, during the Ilbert Bill agitation, nor by the students who flocked round the court during the trial of Surendra Nath Banerji in 1883. It has, however, obtained an evil notoriety in the agitation that followed the partition of Bengal.

১৮৯৪ সালেই অবশ্য অরবিন্দ Induprakash পত্রিকায় লিখলেন, বঙ্কিম-সাহিত্যের প্রভাবে, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব কমে আসছে, লোকের মন হিন্দুধর্মের দিকে ফিরছে। তরুণদের মধ্যে উগ্র জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হচ্ছে। কেশব সেন ও কৃষ্ণদাস পালের অনুসরণকারী দাসসুলভ ইংরেজ অনুকরণকারী তরুণদের পরিবর্তে বঙ্কিম-অনুপ্রাণিত তরুণরা এসে গেছেন।

এর আগে ১৮৮৪ সালে হিন্দুধর্ম প্রবক্তা বঙ্কিমচন্দ্র ও আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথের প্রবল মসীযুদ্ধ হয়ে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্রাহ্মবিদ্বেষ

এবং বিধবাবিবাহ-জাতীয় সংস্কারবিমুখতা তখন খুবই লোকপরিজ্ঞাত। তবে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অশ্রদ্ধা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রও রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে স্নেহশীল ছিলেন।

ঠিক কবে জানা যায় না, কিন্তু ১৩৪৪ সালে রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা হলো, রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম্-এর প্রথমাংশ নিজে সুর বসিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে শুনিয়েছিলেন।

১৮৮৫ সালে বালক পত্রিকায় জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সম্পাদনায় দেশ রাগে বন্দে মাতরমের কিয়দংশ স্বরলিপি সহযোগে প্রকাশিত হলো। বন্দেমাতরম্ তখনই বিখ্যাত, একথা বালক পত্রিকায় লেখা হলো। যদিও গানটির প্রকাশ হয় বঙ্গদর্শনে ১৮৮১ সালে আনন্দমঠে, ১৮৭৫ সালে গানটির রচনা হয়েছে অনুমিত হলেও।

১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন বসলো কলকাতায়, তাতে বন্দে মাতরম্ গীত হলো, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাখীবন্ধন কবিতার মারফৎ সেটা আমরা জানতে পারছি। সেই অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু গাইলেন স্বরচিত গান, আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।

রবীন্দ্রজীবনীতে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, ১৮৯০ সালে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্তান্তে লেখেন 'বন্দেমাতরম্' এবং আনন্দমঠের বাইরে জাতীয় ধ্বনি হিসেবে এই প্রথম এর ব্যবহার ঘটল।

১৮৯৬ সালে কলকাতার কংগ্রেস অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ বন্দে মাতরম্ গাইলেন উদ্বোধন সংগীত হিসেবে। ওই অধিবেশন উপলক্ষ্যেই তিনি রচনা করলেন 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী'। এই গানটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, তাঁকে অনুরোধ করা হয়েছিল, দুর্গামূর্তির সঙ্গে মাতৃভূমির দেবীরূপ মিশিয়ে গান লিখতে। অনুরোধ করেছিলেন বিপিনচন্দ্র পালের মতো লোকেরা। এই দুর্গামূর্তির জন্যই রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বন্দে মাতরমকে গ্রহণ করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করে লিখলেন এই 'ভুবনমনমোহিনী' দেশমাতৃকার স্তব, পূজার গান নয়। রবীন্দ্রনাথের মতে অবশ্য তাঁর এই গানটিও সাম্প্রদায়িক গান, সর্বভারতীয় গান নয়। পরবর্তী যুগে তিনি বন্দে মাতরম্ গানের শুধু প্রথম অংশটিই সর্বভারতীয় গান বলে অভিহিত করেছেন। বাকি অংশটুকু প্রবলভাবেই সাম্প্রদায়িক গান বলে তিনি বিবেচনা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব কখনোই একরেখ ছিল না। তাঁর বয়স যখন বার তের তখন বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ চন্দ্রশেখর বেরুচ্ছে: "একে তো তাহার জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম। তাহার পরে বড়োদলের পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরও বেশি দুঃসহ হইত।" (জীবনস্মৃতি)। এর পর পনেরো বছর বয়সে তিনি মরকতকুঞ্জে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রথম দেখলেন, সেই দর্শন দেবদর্শনের মতো। একুশ বছর বয়সে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে সন্ধ্যাসংগীত সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনলেন (১৮৮২)। এর পরের বছর বঙ্কিমচন্দ্র জানালেন, বউঠাকুরাণীর হাট স্থানে স্থানে অতি সুন্দর উচ্চদরের কিন্তু উপন্যাস হিসেবে নিষ্ফল। তাঁর মতে, উদীয়মান লেখকদের মধ্যে (শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং রবীন্দ্রনাথ) রবিই বেশ গিফটেড কিন্তু প্রিকশাস। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ 'বউঠাকুরাণীর হাট' বেরুবার পর বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে অযাচিত প্রশংসাপত্র পেয়েছিলেন, তাঁর কাছে এই উৎসাহবাণী ছিল বহুমূল্য। এর পরের বছর ঘটল ধর্মবিষয়ে মসীযুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের। দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই তর্কে রবীন্দ্রনাথের বিপক্ষেই ছিলেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ অনুতাপ প্রকাশ করেছিলেন ভারতীতে তাঁর এই বঙ্কিমবিরোধী প্রবন্ধ ছুটোর জন্য। ১৮৯২ সালে রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ বেরুলে বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানালেন। ১৮৯৩ সালে রবীন্দ্রনাথ চৈতন্য লাইব্রেরিতে পাঠ করলেন 'ইংরেজ ও ভারতবাসী'। সভাপতি বঙ্কিমচন্দ্র। পাঠ করবার আগের দিন তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে বক্তৃতাটি দেখিয়ে এসেছিলেন, সম্ভবত রায়বাহাদুর বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনীতিগত নিরাপত্তার জন্যই। ১৮৯৪ সালের মে মাসে বেরুল তাঁর 'রাজসিংহ' বিষয়ে প্রশস্তিমূলক লেখা। সেই মাসেই বঙ্কিমচন্দ্র পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমশোকসভা আয়োজন করার চেষ্টা করলেন, নবীনচন্দ্র সেনের বিরোধিতায় সেই শোকসভা হলো না। রবীন্দ্রনাথ পাঠ করলেন তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধ চৈতন্য লাইব্রেরিতে। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে দানের জন্য বাঙালির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। কিন্তু কয়েকমাসের মধ্যেই 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধে বঙ্কিমের মননশীলতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সন্দেহ প্রকাশ হলো। এর পর ১৯০২ সালে রবীন্দ্রনাথ আবার বঙ্কিমের সাহিত্যসমালোচনা বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশ করলেন, শকুন্তলা প্রবন্ধে। বঙ্কিমচন্দ্র কালিদাস ও

শেক্সপীয়ারের মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে সেই সাদৃশ্য একেবারে অমূলক।

শ্রীসরলাদেবী চৌধুরাণী তাঁর 'জীবনের ঝরাপাতা' গ্রন্থে লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথই 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রথম সুর বসিয়েছিলেন। তাঁর দেওয়া সুরে ঐ দুটি পদে গানটি সর্বত্র চলিত হল। একদিন মাতুল আমায় ডেকে বললেন, 'তুই বাকিটুকুতে সুর দিয়ে ফেল্ না।' ওরকম ভার মাঝে মাঝে আমায় দিতেন। তাঁর আদেশে 'সপ্তকোটিকণ্ঠ কলকলনিনাদ করালে' থেকে শেষ পর্যন্ত ভাবের সঙ্গে ও গোড়ার সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুর দিয়ে ফুটিয়ে নিলুম। দুই একটা জাতীয় উৎসবে সমস্বরে বহুকণ্ঠে বহুজনকে গাইতেও শেখালুম। সেই থেকে সভাসমিতিতে সমস্তটাই গাওয়া হতে থাকল।

"'বন্দে মাতরম্' শব্দটি মন্ত্র হল সব প্রথম যখন মৈমনসিংহের সুহৃদ সমিতি আমাকে স্টেশন থেকে তাদের সভায় প্রোসেশন করে নিয়ে যাবার সময় ঐ শব্দদুটি হুংকার করে যেতে থাকল। সেই থেকে সারা বাংলায় এবং ক্রমে ক্রমে সারা ভারতবর্ষে ঐ মন্ত্রটি ছড়িয়ে পড়ল—বিশেষ করে পূর্ববঙ্গে যখন গবর্ণর সাহেবের অত্যাচার আরম্ভ হল আহিমালয়কুমারিকা পর্যন্ত ঐ বোলটি ধরে নিলে।"

সরলাদেবীর স্মৃতিকথা থেকে মনে হয় ময়মনসিংহে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনী অর্থাৎ ১৯০৫ সালের আগে 'বন্দে মাতরম্' জাতীয় মন্ত্র হিসাবে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয় নি। সরলাদেবী তাঁর স্মৃতিকথায় সনতারিখ কখনও উল্লেখ করেন নি। ফলে কয়েকটি বিষয় অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে। 'বালক' পত্রিকায় 'বন্দে মাতরম্'এর কিয়দংশের স্বরলিপি বের হয় ১৮৮৫ সালে। তখন সরলাদেবীর বয়স তের। ধরে নেওয়া যায় সেই সময়ে প্রকাশিত স্বরলিপি তাঁর নয়। তিনি এই স্বরলিপি যে আছে তা জানতেনও না। সুর হয়তো রবীন্দ্রনাথের হয়তো প্রতিভাসুন্দরী দেবীর, যাঁর নামে স্বরলিপি বেরিয়েছিল। ১৮৯৬ সালের কলকাতা কংগ্রেসে রবীন্দ্রনাথ যখন 'বন্দে মাতরম্' গাইলেন, তখনকার সুর হয়ত, প্রথম পদদুটোর রবীন্দ্রনাথের, পরবর্তী অংশ সরলাদেবীর।

তবে 'বন্দে মাতরম্' গানটি জনপ্রিয় করার ব্যাপারে সরলাদেবীই ছিলেন অগ্রণী। এলাহাবাদ কংগ্রেসে (১৯১০) তিনিই সপ্তকোটির স্থলে ত্রিংশকোটি বলে গেয়ে বন্দে মাতরম্‌কে সর্বভারতীয় করে নিলেন।

অবশ্য সরলাদেবী বহু পরে তাঁর স্মৃতিকথা লিখেছেন। ফলে অনেক সময়েই তাঁর কালবিভ্রম ঘটে থাকতে পারে। ওই স্মৃতিকথায় কিছু আগেই তিনি লিখেছেন :

"'বন্দে মাতরম্' এর প্রথম দুটি পদে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) সুর দিয়েছিলেন নিজে। তখনকার দিনে শুধু সেই দুটি পদই গাওয়া হত। একদিন আমার উপর ভার দিলেন। 'বাকি কথাগুলতে তুই সুর বসা। তাই—'ত্রিংশকোটিকণ্ঠ কলকলনিনাদ করালে' থেকে শেষ পর্যন্ত কথায় প্রথমাংশের সঙ্গে সমন্বয় রেখে আমি সুর দিলাম। তিনি শুনে খুশী হলেন। সমস্ত গানটা তখন থেকে চালু হল।'

এমনও হতে পারে, এলাহাবাদ কংগ্রেসের আগেই, সরলাদেবী রবীন্দ্রনাথকে শোনানোর সময় ত্রিংশকোটি শব্দটিও যুক্ত করেছিলেন। অথবা এই শেষের উক্তিতে ভ্রমবশত তিনি সপ্তকোটি বলতে গিয়ে ত্রিংশকোটি বলে ফেলেছেন।

'বন্দে মাতরম্' কীভাবে চালু হচ্ছে তার কিছু ইঙ্গিত দিচ্ছেন সরলাদেবী, "পঞ্জাবেও আমি যাবার পর থেকে মেয়েদের সঙ্গীতচর্চা ভালরকম হতে থাকল। মাদ্রাজ, মহীশূর ভিন্ন আর কোন অংশে মেয়েদের সঙ্গীতজীবন একেবারে বিকশিত দেখি নি—সে সঙ্গীতের তুলনা উত্তর ভারতে নেই। 'বন্দে মাতরম্'ও আমার গাবার পর থেকে ক্রমে ক্রমে ভারতে সর্বত্র মেয়েদের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল। 'বন্দে মাতরম্' এর কথায় মনে পড়ে দিল্লী থেকে একজন বৃদ্ধ বড়ো ইংরেজ ব্যারিস্টার একবার লাহোরে একটা মকদ্দমায় এসেছিলেন। আমাদের বাড়ি চায়ে এসে সেই সময় বাঙলার অফিসারদের দ্বারা স্থানে স্থানে নিষিদ্ধ গানটি শুনতে কৌতূহল প্রকাশ করেন। আমি গাইলুম—পিয়ানো সহযোগে। তিনি শুনে বললেন—By Jove! কথা বুঝি না বুঝি তোমার গাওয়া শুনে বুঝেছি কি তুমুল আলোড়ন আনতে পারে মনে। আমার স্বামীর দিকে ফিরে বললেন—আমি যদি Bengal Government হতুম তোমার স্ত্রীর বিরুদ্ধে externment order জারি করতুম, যাতে আর কখনো বাঙলায় গিয়ে বাঙালীদের মাতিয়ে তুলতে না পারে।"

সরলাদেবীর বিয়ে হয় ১৯০৫ সালে। এবং বাঙলার অফিসারদের দ্বারা বন্দে মাতরম্ স্থানে স্থানে নিষিদ্ধ হয়েছে ১৯০৬ সালেই। সুতরাং ধরা যায় এটা ১৯০৬ এর কাছাকাছি সময়।

১৯৩৭ সালে কলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বিবেচনা করতে বসেন 'বন্দে মাতরম্' কে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করা যায় কি না। এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ জওহরলাল নেহরুকে যে চিঠি লেখেন ২৬শে অক্টোবর, তা থেকে আমরা এই খবর পাচ্ছি :

(১) বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় রবীন্দ্রনাথই প্রথম স্তবকে সুর দেন। যদু ভট্টের দেওয়া সুর থাকলেও, তা তখনও পরিজ্ঞাত ছিল না, এখনও নেই।

(২) কলকাতা কংগ্রেসে রবীন্দ্রনাথ প্রথম ওই গান করেন, ১৮৯৬ সালে।

এই তথ্য যদি আমরা গ্রহণ করি, তাহলে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাখীবন্ধন অবলম্বনে যে অনুমান করা হয় যে ১৮৮৬ সালেও বন্দে মাতরম্ গীত হয়েছিল, তা অগ্রাহ্য করতে হয়। ১৮৮৬ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথও ছিলেন এবং 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গানটি গেয়ে শুনিয়েছিলেন। বন্দে মাতরম্ সেই কংগ্রেসে গীত হলে রবীন্দ্রনাথের তা অজানা থাকার কথা নয়।

(৩) বন্দে মাতরমের প্রথম স্তবকটি রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল কারণ, "the spirit of tenderness and devotion...the emphasis it gave to beautiful and beneficial aspects of our motherland made special appeal."

(৪) গানটির অন্যান্য অংশ, আনন্দমঠের অনেক অংশ যার সঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' গানটি বিশেষভাবে জড়িত, রবীন্দ্রনাথের কাছে ভালো লাগে নি, "with all sentiments of which, brought up as I was in the monotheistic ideals of my father, I could have no sympathy."

(৫) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় 'বন্দে মাতরম্' জাতীয় সঙ্গীতের মতো হয়ে ওঠে।

(৬) তরুণদের আত্মাহুতির মধ্য দিয়ে 'বন্দে মাতরম্' জাতীয় স্লোগান হয়ে ওঠে।

(৭) সমস্ত উপন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে 'বন্দে মাতরম্'-এর পুরো গানটি সাম্প্রদায়িকতা দোষে দুষ্ট।

(৮) কিন্তু গানটির প্রথম স্তবকটি পুরো গান থেকে আলাদা করে নেওয়া

সম্ভব। এবং এই স্তবকটি স্বতন্ত্র এবং প্রেরণাদাত্রী বলে জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে বিবেচিত হওয়ার উপযুক্ত।

এইবার গানটি দেখা যাক্।

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্,
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্,
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
সপ্তকোটীকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল-দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্ অমলাং অতুলাম্,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্ মাতরম্।

রবীন্দ্রনাথ এবং সরলাদেবীর সাক্ষ্যে আমরা জানতে পারছি রবীন্দ্রনাথ সুর

দিয়েছিলেন বন্দে মাতরম্ থেকে বরদাং মাতরম্ পর্যন্ত। বাকি অংশে সুর দেন সরলাদেবী এবং রবীন্দ্রনাথ সেটা শুনে খুশি হন। সভাসমিতিতেও পুরো গানটাই গাওয়া হতো।

গানটির দ্বিতীয় স্তবকেও রবীন্দ্রনাথের আপত্তিজনক এমন কিছু নেই, যা প্রথম স্তবকে নেই। তৃতীয় স্তবকের শেষ পংক্তিতে 'তোমারই প্রতিমা' এবং চতুর্থ স্তবকের দুর্গার ছবি ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের পৌত্তলিকতাবিরোধী সংস্কারকে আহত করে থাকবে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অবশ্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অভিমতের খবর দিয়েছেন—নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্ম রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এই গানটিকে পৌত্তলিকতা-ব্যঞ্জক বা মুসলমানবিদ্বেষ-জনক বলে মনে করতেন না। সরলাদেবীর কথা যদি মানতে হয়, তাহলে ধরে নিতে হবে সভাসমিতিতে পুরো গানটাই গাওয়া হতো এবং প্রথম দিকে সেই অনেক সভাসমিতিতেই রবীন্দ্রনাথ উৎসাহী অংশী ছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরম্ সংগীত বাঙালী মনকে প্রচণ্ড উত্তেজনার খোরাক দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বন্দে মাতরম্ সম্পর্কে দৃষ্টি এবং অনুভব বোঝার জন্য এই পারিপার্শ্বিকের সন্ধান নেওয়া প্রয়োজন। রমেশচন্দ্র মজুমদারের বাংলা দেশের ইতিহাস (আধুনিক যুগ) থেকে কয়েকটি তথ্য দেখা যাক।

(১) ঐ দিন (১৬ অক্টোবর, ১৯০৫ ; ৩০ আশ্বিন, ১৩১২, অর্থাৎ যেদিন বঙ্গব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা আইন অনুসারে কার্যে পরিণত হইল) শোক প্রকাশের চিহ্নস্বরূপ শিশু ও রোগী ব্যতীত সকলেই উপবাস করিবেন এবং কাহারও পাকশালায় রন্ধনক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইবে না। সকলেই নগ্নপদে থাকিবে। দোকানপাট বন্ধ থাকিবে। ঘোড়ার গাড়ী বা গোরুর গাড়ী চলিবে না। যুবকগণ সূর্যোদয়ের পূর্বে উঠিয়া "বন্দে মাতরম্" সংগীত গাহিতে গাহিতে গঙ্গাস্নান করিবে।

(২) (৩০শে আশ্বিন) অপরাহ্নে অখণ্ড বঙ্গ-ভবন স্থাপনের উদ্দেশ্যে কলিকাতার পার্শিবাগান মাঠে (এখন যেখানে ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়) ফেডারেশন হল বা 'মিলন মন্দিরে'র ভিত্তি স্থাপিত হইল। রোগশয্যাগত আনন্দমোহন বসু সভাপতিত্ব করিলেন। আরাম কেদারায় করিয়া তাঁহাকে সভাস্থলে আনা হইল। প্রায় পঞ্চাশ হাজার কণ্ঠে উচ্চারিত 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনির মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উঠিয়া সভাপতির অভিভাষণ পাঠ

করিলেন। ইংরেজীতে আশুতোষ চৌধুরী ও বাংলায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইহা পাঠ করিলেন।

(৩) তিন সপ্তাহ পরে পশুপতি বসুর ভবনে বিজয়া দশমীর পরদিন (২১শে কার্ত্তিক) বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হইল।...এই সভায় রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা করেন তাহার উপসংহার উদ্ধৃত করিতেছি : "...আজ বাংলাদেশের সমস্ত ছায়াতরুনিবিড় গ্রামগুলির উপরে এতক্ষণ যে শারদ আকাশে একাদশীর চন্দ্রমা জ্যোৎস্নাধারা অজস্র ঢালিয়া দিয়াছে, সেই নিস্তব্ধ শুচিরুচির সন্ধ্যাকাশে তোমাদের সম্মিলিত হৃদয়ের 'বন্দে মাতরম্' গীতধ্বনি এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া যাক্।"

(৪) রংপুর। রংপুরের জিলা স্কুলের হেডমাষ্টার ৩১শে অক্টোবর (১৯০৫) এক বিজ্ঞপ্তি দিলেন যে, স্বদেশী আন্দোলনে পিকেটিং প্রভৃতি কোনরূপ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিলে ছাত্রগণকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে। ছাত্রেরা ইহা অগ্রাহ্য করিয়া ঐ দিনই এক স্বদেশী সভায় যোগদান করিল। স্বদেশী গীত গাহিল এবং বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে সারা পথ মুখরিত করিয়া গৃহে ফিরিল।

(৫) ১৯০৫ সনের ৮ই নভেম্বর পূর্ববঙ্গের ছাত্র ও শিক্ষক দমনের জন্য চীফ সেক্রেটারী P. C. Lyon ঢাকা বিভাগের কমিশনারের নিকট দুইটি সার্কুলার পাঠাইলেন। তাহাতে এই দমননীতি আরও প্রকট হইয়া উঠিল।... নিষিদ্ধ আচরণগুলি এই : রাস্তায় বা প্রকাশ্যে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করা।

(৬) কলিকাতার ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় রিপোর্ট বাহির হইল—সারা অক্টোবর মাসে (১৯০৫), বিশেষতঃ পূজার সময়, সমগ্র বরিশাল জেলায় ...শহরে ও জিলার সর্বত্র সভাসমিতির অধিবেশন হইতেছে এবং বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ করিতেছে। কোন কোন স্থানে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা অসম্ভব হইয়াছে।

(৭) হুকুমের পর হুকুম জারি করিয়া ফুলার সাহেব প্রকাশ্য স্থানে সভাসমিতি বন্ধ করিয়াছেন। কোন ছাত্র বা অন্য কেউ রাস্তায় বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করিলেই পুলিশ তাহাকে ফৌজদারী কয়েদীর মত গ্রেপ্তার করে।

(৮) পরদিন দুপুরবেলা (১৯০৬ সনের ১৪ই এপ্রিল, বরিশাল প্রাদেশিক সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনের সময়ে) সভাপতি এ. রসুল ও তাঁহার বিলাতী মেম গাড়ীতে এবং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, মতিলাল ঘোষ এবং

ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পদব্রজে চলিলেন। তাঁহাদের কেহ বাধা দিল না। কিন্তু তাহাদের পশ্চাতে 'বন্দে মাতরম্' ব্যাজ ধারণ করিয়া যুবকের দল যেই রাস্তায় আসিল, অমনি ছয় ফুট লম্বা মোটা লাঠি দিয়া পুলিশ তাহাদের গুরুতর প্রহার করিতে লাগিল এবং 'বন্দে মাতরম' ব্যাজ জোর করিয়া ছিনাইয়া লইল। মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার পুত্র চিত্তরঞ্জনকে মারিতে মারিতে পার্শ্বের পুকুরে ফেলিয়া দিল। কিন্তু এই অবস্থাতেও সে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিতে বিরত হইল না।

(৯) চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীর মুখপত্র 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকায় জ্বালাময়ী ও অনন্যসাধারণ ভাষায় তাঁহার (ফুলারের) বিরুদ্ধে যে সকল লেখা প্রকাশিত হইত তাহার জন্য সম্পাদক হিসাবে অরবিন্দ ঘোষ বিদ্রোহের অভিযুগে অভিযুক্ত হইলেন (১৯০৭, আগস্ট)।

এই পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথের মানসিক বিবর্তনের পথ সন্ধান করা যেতে পারে। ১৩১২ সালের ৩০শে আশ্বিন সকালবেলায় রবীন্দ্রনাথ বন্দে মাতরম্ সম্প্রদায় পরিচালিত শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন। ১৩১৪ সালের ৯ই ভাদ্র আমেরিকায় রথীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্রনাথ চিঠি লিখছেন, "Statesman কাগজের চাঁদা ফুরলেই আর পাঠাব না। এখন থেকে 'বন্দে মাতরম' কাগজ পাঠাতে থাকব। ওটা খুব ভালো কাগজ হয়েচে। কিন্তু অরবিন্দকে যদি জেলে দেয় তাহলে ও কাগজের কি দশা হবে জানি নে।" মধ্যে বরিশাল প্রাদেশিক সম্মিলনীর সাহিত্য সম্মিলনীর সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। যদিও বরিশালের সম্মিলনী পুলিশের তাণ্ডবে অনুষ্ঠিত হয় নি। রবীন্দ্রনাথের সভাপতি হওয়া নিয়ে কাগজেপত্রে তীব্র সমালোচনা হয়েছিল, মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ যোগ্য সভাপতি কিন্তু শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চন্দ্রনাথ বসু বা নবীনচন্দ্র সেনকে আগে সভাপতি করা উচিত ছিল। এই সময় রবীন্দ্রনাথ ২৫শে চৈত্র ১৩১২ আগরতলা থেকে চিঠি লিখছেন মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে "ঘুরিয়া মরিতেছি। সম্প্রতি আগরতলায় আটকা পড়ে গেছি। বরিশালে যাইতে হইবে। তাহার পর চাটগাঁয়ে যাইবার কথা কিন্তু আমার মন বিদ্রোহী হইতেছে। বোলপুরে গিয়া একেবারে নিশ্চেষ্টতার মধ্যে ডুব মারিয়া বসিতে ইচ্ছা করিতেছে। শনি আমাকে ঘুরাইতেছে। রবি তাহার সঙ্গে পারিয়া উঠিল না।"

এই বিষয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন :

"পরযুগে অনেকে বলিতেন যে, গবর্মেণ্টের ধর্ষণনীতি অবলম্বনের পর হইতে কবি রাজনীতির পথ ত্যাগ করেন। সেকথা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ রবীন্দ্রনাথ এই আন্দোলনের সহিত যথার্থভাবে তিন মাস মাত্র যুক্ত ছিলেন—১৩১২ সালের আশ্বিন হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত। এই কয়েক মাসের অভিজ্ঞতার কথা তিনি 'বিদায়' কবিতায় প্রকাশ করেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস : 'বিদায় দেহ ক্ষম আমায় ভাই। কাজের পথে আমি তো আর নাই।' এইটি লিখিত হয় চৈত্রমাসে (১৩১২)। তখনো বরিশালের যজ্ঞভঙ্গ হয় নাই, ইংরেজের রুদ্রশাসন দেখা দেয় নাই। বাংলাদেশে রুদ্রপন্থীদের রাজনৈতিক হত্যাদি সংঘটিত হয় নাই।...বাঙালি তাঁহার গানগুলি কণ্ঠে তুলিয়া লইল। তাঁহার কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করিল না।"

গানগুলি কী? রবীন্দ্রনাথ এসময়ে প্রবলভাবে স্বদেশী গান লিখছেন। ১৩১২ ভাদ্র-আশ্বিনের ভাণ্ডারে প্রকাশ হলো পনেরোটি স্বদেশী গান। ১৩১২ আশ্বিনের বঙ্গদর্শনে দুটো স্বদেশী গান। ১৩১২ কার্তিকের বঙ্গদর্শনে তিনটি স্বদেশী গান। এই সব গানগুলোর মধ্যে দেশকে 'মা' বলে ভাবা হয়েছে (বন্দে মাতরম্ গানের মতো) এই এই গানে : (১) আজ বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি (২) মা কি তুই পরের দ্বারে (৩) যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক (৪) আমার সোনার বাংলা (৫) ও আমার দেশের মাটি (৬) সার্থক জনম আমার (৭) আমরা পথে পথে যাব সারে সারে।

লক্ষ্য করবার বিষয়, গীতবিতানে যে ৪৬টি স্বদেশমূলক গান সংগৃহীত হয়েছে, তার ২৩টি গানই ১৩১২ সালে রচিত, ১০টি গান ১৩১২ সালের আগে এবং বাকি ১৩টি মাত্র ১৩১২-এর পর। পরবর্তী গানগুলো বেশির ভাগই নাটক রচনার সূত্রে প্রস্তুত। প্রমদারঞ্জন ঘোষ তাঁর 'আমার দেখা রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর শান্তিনিকেতন' (১৯৬৩) গ্রন্থে লিখেছেন, "রবীন্দ্রনাথের নাতি স্বর্গীয় দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখে শুনেছি, ঐ যুগে দেশের গান রচনার সময় রবীন্দ্রনাথের চোখ দিয়ে জল ঝরতো।"

পরবর্তীযুগে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশমূলক গান লেখেন নি কেন? এলমহার্স্ট তাঁর Poet and Plowman গ্রন্থে ১৯২২ সালের ১৫ মার্চের দিনলিপিতে লিখেছেন : 'My father was', Rathi said, "warned by the

British Government not to compose any more songs that might fire patriotic fervour".[১]

রোটেনস্টাইন এবং রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী রক্ষিত হয়েছে যে গ্রন্থে, Imperfect Encounter, সেই গ্রন্থেও আমরা খবর পাচ্ছি লর্ড কার্জন কী পরিমাণ ক্রুদ্ধ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের উপর। ১৯১২ সালে রবীন্দ্রনাথ যখন ইংল্যাণ্ডে গেলেন তখন সেখানকার রবীন্দ্র-অনুরাগীরা চেষ্টা করেছিলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে কোনো ডিগ্রি দেওয়ানোতে। অক্সফোর্ডের চ্যান্সেলর তখন লর্ড কার্জন। ফক্স স্ট্রাউওয়েজ তাঁর ধারণা বলছেন, লর্ড কার্জন "did not wish a University of which he is Chancellor to take public notice of one who had added politically to the labours of the Viceroy."

এর আগে, ১৯১১ সালে পূর্ববঙ্গ-আসাম সরকারের গোপন ইস্তাহারের ফলে শান্তিনিকেতন সরকারী কর্মচারীদের সন্তানদের পক্ষে শিক্ষার অনুপযোগী বিবেচিত হয়েছিল; ছাত্ররা দলে দলে শান্তিনিকেতন ত্যাগ করেছিল এবং শিক্ষক হীরালাল সেনকেও শান্তিনিকেতন ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের জন্য একটা কোড নম্বরও ধার্য করেছিল পুলিশ।

কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের ভয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের কথা ভাববেন না, এটা অনুমান করা শক্ত। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'ঘরোয়া' গ্রন্থে বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ যখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রাজনৈতিক আলোচনা করতেন অন্যদের সঙ্গে তখন পুলিশ প্রায়ই হানা দিত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ এই কয়টি প্রবন্ধ প্রকাশ্য সভায় পাঠ করেছিলেন অথবা প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

দেশনায়ক : ১৩১৩, ১৫ বৈশাখ, পশুপতি বসুর গৃহপ্রাঙ্গণে।
স্বদেশী আন্দোলন : ১৩১৩, কার্তিক, ভাণ্ডার, ডন সোসাইটির সভায়।
সাহিত্য সম্মেলন : ১৩১৩ কলিকাতা কংগ্রেসের সাহিত্যসম্মেলন।
ব্যাধি ও প্রতিকার : ১৩১৪ শ্রাবণ, প্রবাসী
যজ্ঞভঙ্গ : ১৩১৪ প্রবাসী
পাবনা সম্মিলনীর সভাপতির ভাষণ : ১৩১৪
পথ ও পাথেয় : ১৩১৫, ১২ জ্যৈষ্ঠ, চৈতন্য লাইব্রেরি।
সমস্যা : ১৩১৫, আষাঢ়, প্রবাসী
সদুপায় : ১৩১৫, শ্রাবণ, প্রবাসী

পূর্ব ও পশ্চিম : ১৩১৫, ভাদ্র, প্রবাসী
প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (সংক্ষিপ্ত) : ১৩১৫ ভাদ্র, বঙ্গদর্শন
দেশহিত : ১৩১৫ আশ্বিন, বঙ্গদর্শন

১৩১৫-এর পর থেকে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক বক্তৃতা ও প্রবন্ধ অবশ্য বন্ধ হয়ে যায়। আবার শুরু হয় বহু পরে ১৩২৬ সালে 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' বক্তৃতাপাঠের সময়।

রাজরোষের ভয়ে না হলেও, 'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে রবীন্দ্রদৃষ্টি পালটাচ্ছে বোঝা যায়, এই সময়কার তাঁর বিবর্তন লক্ষ্য করলে। ১৩১৩ সালের কলকাতা কংগ্রেসের সাহিত্যসম্মেলনেও তিনি 'বন্দে মাতরম্'কে মহামন্ত্র বলছেন। কিন্তু সুরাট কংগ্রেসের তাণ্ডবের পর ১৩১৪ সালের ২৩ পৌষ রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্রকে লিখছেন, "আমাদিগকে নষ্ট করিবার জন্য আর কারো প্রয়োজন হইবে না—মলিরও নয় কিচেনারেরও নয়, আমরা নিজেরাই পারিব। আমরা বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করিতে করিতে পরস্পরকে ভূমিসাৎ করিতে পারিব।"

'বন্দে মাতরম্' সম্পর্কে মত পরিবর্তন দুটো কারণে ঘটছে। একটা, দেশের লোকের 'বন্দে মাতরম্' আওড়ানোই কেবল তাঁর ভালো লাগছিল না, সেই মন্ত্রের সঙ্গে প্রকৃত দেশসেবার কোন যোগাযোগ ছিল না বলে।[২,৩] দ্বিতীয় কারণ, দেশকে মা বলে ভাবা তাঁর পক্ষে সহজ ছিল না।

দ্বিতীয় কারণটি নিয়ে প্রথমে আলোচনা করা যাক। ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথের মানসিক গঠনে সাকার দেশমাতৃকা কল্পনা কতটা কষ্টসাধ্য ছিল, তার কিছু আভাস পাওয়া যাবে, রথীন্দ্রনাথের আচরণে। এলমহার্স্ট তাঁর Poet and Plowman-এর স্মৃতিচারণায় লিখছেন :

Rathi Tagore once told me of how, after his return from studying in America in 1909, he was nearly persuaded to join the revolutionaries in Bengal who had decided that forceful methods were the sole means left to them of bringing about the overthrow of the Imperial Government. He had at the last moment been inhibited, however, by the form of oath he was told he would have to swear at his initiation in front of the image of the Goddess Kali.

সন্ত্রাসবাসীদের কাছে 'বন্দে মাতরম্' ছিল প্রিয় মন্ত্র।[৪]

প্রমদারঞ্জন ঘোষ লিখছেন,

"সে বছর দেশমাতার মূর্তি হিসাবে শিবাজীর পূজিত ভবানীদেবীর মৃণ্ময়ীমূর্তির পূজা নাকি ছিল উৎসবের অঙ্গ। প্রতিমা পূজা রবীন্দ্রনাথের সংস্কারে বাঁধে। তাই তিনি ভবানীপূজায় যোগ দিলেন না। ধূমধামের সঙ্গে পূজা হলো। সেবার তিলক নাকি পঁচিশ হাজার লোকের সঙ্গে মিছিল করে গঙ্গাস্নানে গিয়েছিলেন। মিছিলে আগে ছিল অবনীন্দ্রনাথের আঁকা ভারতমাতার প্রসিদ্ধ ছবিখানা।"

১৮৯৯ সালে সরলাদেবীরা অনেকে কাশী বেড়াতে গিয়ে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে আরতি দেখে প্রণাম করেছিলেন। "এই কথাটা কলকাতায় ফিরে গেলে রবিমামার কানে যখন পৌঁছল তিনি আমাদের প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট হয়ে বললেন, 'তোরা এই রকম করে পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় দিলি? মিথ্যাচার করলি?'"

সরলাদেবী কিন্তু এটা লক্ষ্য করতে ভোলেন নি, রবীন্দ্রনাথের হাতে ব্রহ্মসঙ্গীতের বিপুল পরিবর্তন ঘটছিল। রামমোহন যুগের পরবর্তী ব্রহ্মোৎসবের রবীন্দ্রের ব্রহ্ম বা ঈশ্বর অপাণিপাদ নন, তিনি সর্বতো অক্ষি সর্বত্র শিরোমুখ। রামমোহন রায়ের সময়কার নিরাকার ব্রহ্ম রবীন্দ্রনাথের হাতে সাকার হয়ে গেছে। "অথচ ভাবের চৌকাঠ পেরিয়ে গেলেই—মাটি-খড়ে, ধাতু-প্রস্তরে, বর্ণে-চিত্রে ভাবের উপলক্ষ্য ভগবানকে পূর্ণ লক্ষ্য করে মূর্ত করে আঁকড়ে ধরলেই রবীন্দ্রনাথ উদ্ভ্রান্ত বিচলিত হয়ে উঠতেন।"

একদিকে যেমন রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম সংস্কারে দেশকে মূর্তিমতী মা বলে ভাবা কষ্টসাধ্য হচ্ছে, তার থেকেও বড়ো দুঃখের কারণ, রবীন্দ্রনাথের কর্মপদ্ধতি দেশের লোকে গ্রহণ করছে না।[৫]

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক বক্তৃতা এবং প্রবন্ধ পাঠ করলে যে কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হলো, রাজনৈতিক আন্দোলনের চাইতে তিনি গুরুত্ব দিতেন দেশগঠনের উপর বেশি। পল্লীকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে হবে প্রথমে, তার পর রাষ্ট্রীয় আন্দোলন। একেই তিনি বরাবর বলে এসেছেন আত্মশক্তি।

রবীন্দ্রনাথের আত্মশক্তি বনাম রাষ্ট্রশক্তির এই দ্বন্দ্ব বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যাত হতে পারে। যাঁরা মনে করেন রবীন্দ্রনাথ ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সম্মুখ

সমরে নামতে দ্বিধাগ্রস্ত, তাঁরা তাঁর এই আত্মশক্তির উপর জোর দেওয়াটা তাঁর পলায়নী মনোবৃত্তি বলে মনে করতে পারেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পল্লী গঠনের কাজ অন্য দৃষ্টিতেও দেখা যেতে পারে, যাতে মনে হবে তাঁর এই দর্শন ছিল বিপ্লবাত্মক।

যে কোনো যুগান্তকারী বিপ্লবের সময়ে দেখা যায়, একটা দেশে রাষ্ট্রশক্তির সার্বভৌমত্ব খণ্ডিত হয়ে যায়। ইংল্যাণ্ডের বুর্জোয়া বিপ্লবের সময় দেখা গিয়েছিল রাজার হাতে সার্বভৌমত্ব পুরো আয়ত্তে নেই, ইংল্যাণ্ডের বহু লোকের আনুগত্য চলে গিয়েছিল পার্লামেন্টের প্রতি। আমেরিকার স্বাধীনতা বিপ্লবের সময় জনসাধারণের আনুগত্য ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতি আর থাকে নি। ফরাসী বিপ্লবের সময় জনসাধারণের আনুগত্য চলে যায় এস্টেটস জেনারেলের দিকে। সোভিয়েট বিপ্লবের সময় জনসাধারণ অনুগত হয় বিভিন্ন সোভিয়েট সংগঠনের। চীনা বিপ্লবের সময় কুওমিনটাঙ্ সরকারের কথাবার্তা শোনার লোক কমে যায়।

এই সব বিপ্লব পর্যালোচনা করলে যেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হলো বিপ্লব শুধু সংহারমূলক ক্রিয়া নয়, সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিমূলক ক্রিয়াও। যে প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বা সংগঠন ধ্বংস হচ্ছে তার পরিবর্তে কোন্ প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তি বা সংগঠন আসবে, তার প্রকাশ না হলে বিপ্লব ব্যর্থ হতে বাধ্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেশাত্মমূলক সংগঠনের কাজ সচেতনভাবে এই দৃষ্টিতে না দেখলেও, তাঁর কাজ বিপ্লবের এই মূল নীতির অনুসারী। ইংরেজকে দূর করাই সবচেয়ে বড়ো কাজ নয়। ইংরেজকে দূর করার পর কে এই সৃষ্টি কাজে অগ্রসর হবে, এই চিন্তা তাঁকে বিব্রত করেছিল। পল্লীর দারিদ্র্য, অনৈক্য, অবিদ্যা, সংগঠনের অভাব—এই অবস্থায় দেশবাসী কোনো মহত্তর সৃষ্টির দিকে এগুতে পারবে না। সুতরাং ইংরেজ-বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হবার আগে দেশকে তৈরি হতে হবে। এই হচ্ছে তাঁর যাবতীয় রাজনৈতিক প্রবন্ধের একমাত্র বক্তব্য। ইংরেজ সরকারের সার্বভৌমত্ব সংহার করার আগে বা সঙ্গে সঙ্গে যদি দেশের নিজের কোন সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন তৈরি না হয়ে ওঠে, তাহলে কোন বিপ্লবই সার্থক হবে না—বর্তমান পরিভাষায় বলা যায় এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক দর্শন। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ১৯০৫-১৯০৬ সালে এই জাতীয় বক্তব্য আর কেউ রাখেন নি। পরবর্তী যুগেও একমাত্র মহাত্মা গান্ধী এগিয়ে এসেছিলেন এই

সৃষ্টিমূলক কাজে—তাঁর হরিজননীতি, চরকানীতি, পল্লী সংগঠন ইত্যাদির মধ্যে। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক বক্তব্যে মিল ছিল না। কিন্তু সৃষ্টিমূলক কাজে গান্ধীর উৎসাহের জন্যই রবীন্দ্রনাথ গান্ধীকে শ্রদ্ধা করতেন।

রাজনীতি থেকে রবীন্দ্রনাথের সরে আসার মূল কারণ, তিনি এই সৃষ্টিমূলক সংগ্রামে কোন সমর্থন পান নি তদানীন্তন রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের তুমল কোলাহলের পর যখন দেশ ঝিমিয়ে পড়ল, রবীন্দ্রনাথও ক্রমশঃ সরে আসতে লাগলেন এবং নিজের সাধ্যমতো শ্রীনিকেতন-শান্তিনিকেতনের কাজে, নিজের জমিদারিতে সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' গানটি তাঁর এই প্রসঙ্গে লেখা বলে রবীন্দ্রনাথই লিখেছেন, অ্যানড্রুজকে লেখা চিঠিতে (৭ জানুয়ারী, ১৯২১)। ১৯০৮ সালের পর তাঁর রাজনৈতিক প্রবন্ধের অনুপস্থিতির কারণ এটাই সবচেয়ে বড়ো বলে মনে হয়।

'বন্দে মাতরম্' এর প্রতি তাঁর বিরূপতাও সম্ভবতঃ এই কারণ থেকেই সুরু হয় এবং বাড়তে বাড়তে 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র-বিপক্ষতায় পরিণত হয়। প্রমদারঞ্জন ঘোষ লিখেছেন, শান্তিনিকেতন উপাসনায় বক্তৃতা করতে গিয়ে দেশের কথা এসে গেলে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। তাঁর মুখে যেন খই ফুটতে শুরু করত। প্রথম মহাযুদ্ধের কাছাকাছি সময় তাঁরা শুনলেন রবীন্দ্রনাথের মুখে, বন্দে মাতরম্ নয়, নমস্তুতে।

১৯১৬ সালে, ঘরে বাইরে উপন্যাসের শুরুতেই বিমলা জানিয়ে দেয় :

"অথচ স্বদেশী কাণ্ডের সঙ্গে যে আমার স্বামীর যোগ ছিল না বা তিনি এর বিরুদ্ধে ছিলেন তা নয়। কিন্তু 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রটি তিনি চূড়ান্ত করে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি বলতেন, দেশকে সেবা করতে রাজি আছি। কিন্তু বন্দনা করব যাঁকে তিনি ওর চেয়ে অনেক উপরে। দেশকে যদি বন্দনা করি তবে দেশের সর্বনাশ করা হবে।"

পুরো 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসটিই বলা যেতে পারে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের বিরুদ্ধে লেখা।

নেপাল মজুমদার তাঁর 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের

সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে অমৃতবাজার পত্রিকার এক সাংবাদিককে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "'বন্দে মাতরম্' যথেষ্ট হইয়াছে। এখন 'বন্দে মাতরম্' স্থানে 'বন্দে ভ্রাতরম্' বল। জাতীয় পতাকা উড়াইয়া কিংবা তোমাদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ তুলা চরকায় কাটিয়া তোমরা স্বরাজ পাইবে না। জনসাধারণের জন্য গঠনমূলক কার্যের দ্বারা এবং তোমাদের দেশবাসীকে কার্যতঃ সেবা করিয়াই তুমি উহা অর্জন করিতে পারিবে।"[৬]

১৯৩৪ সালে 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

"শুধু মা মা স্বরে দেশকে যারা ডাকাডাকি করে, তারা চিরশিশু। দেশ বৃদ্ধ শিশুদের মা নয়, দেশ অর্ধনারীশ্বর—মেয়ে-পুরুষের মিলনে তার উপলব্ধি।"

১৯৪০ সালে 'ল্যাবরেটরি' গল্পে লিখলেন :

"বাংলাদেশে মেট্রিয়ার্কি বাইরে নেই, আছে নাড়িতে। মা মা শব্দে হাম্বাধ্বনি আর কোনো দেশের পুরুষমহলে শুনেছ কি?"

১৯১০ সালে 'গোরা' শেষ করেন রবীন্দ্রনাথ এই ভাবে,

"গোরা কহিল, 'মা তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসে ছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই, শুধু তুমি কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।'"

দেশকে মা ভাবা রবীন্দ্রনাথের এই বোধ হয় শেষ। এর পর ১৯১৪ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত দীর্ঘ সময় তিনি দেশকে মা বলে ভাবতে বিরক্ত হতেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে যায় তাঁর 'বন্দে মাতরম্'-এর প্রতি অনুরাগ। শেষ পর্যন্ত গানটির প্রথম স্তবকটি যে তিনি অনুমোদন করেছেন, তা-ও বোধ হয় বাধ্য হয়ে।

'বন্দে মাতরম্'-এর অন্তর্লীন অর্থের জন্য ততটা হয়তো নয়, বিরূপতার বড়ো কারণই ছিল মন্ত্রটির অনুৎপাদক ব্যবহার। যে রবীন্দ্রনাথ একসময় তাঁর বক্তৃতা বা প্রবন্ধ শেষ করতেন 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি দিয়ে, সেই রবীন্দ্রনাথ 'বন্দে মাতরম্' শুনলেই ক্ষেপে যেতেন কিছুদিন পরেই।[৭] পরবর্তী কালে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের অর্থ যা-ই হোক, এটা হয়ে ওঠে সাম্প্রদায়িক এবং দলীয় যুদ্ধ-রব। 'বন্দে মাতরম্' ও 'আল্লা হো আকবর' হয়ে উঠেছিল, রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায়, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার যুদ্ধ-চিৎকার, যেমন 'বন্দে মাতরম্' ও 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' হয়ে ওঠে পরে কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট

পাটিগুলির নির্বাচনী দলধ্বনি। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রটির কংগ্রেসের এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের এই ব্যবহারে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের মন। এই বিক্ষোভের পরবর্তী ধাপ হলো রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা থেকে আন্তর্জাতীয়তায় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়া। সেটা অন্য প্রসঙ্গ।

১বহুদিন পূর্বে বর্তমান লেখকের গৃহে একবার কয়েকজন বিপ্লবী নেতা সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন ৺ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী (মহারাজ), ৺প্রতুল গাঙ্গুলি, শ্রীনলিনীকিশোর গুহ, প্রভৃতি। কথা প্রসঙ্গে তাঁহারা বলিলেন, "বিপ্লবী জীবনে রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর গীতি-কবিতাগুলি আমাদের যে কি সাহস ও সান্ত্বনা জোগাইত তাহা বলিয়া বোঝান যায় না। সারা দিন পুলিশের হাত এড়াইবার জন্য বনে জঙ্গলে ঘুরিয়া সন্ধ্যাকালে শ্রান্তদেহে অবসন্ন মনে কোন জলাশয় দেখিলে তাহার জলে তৃষ্ণা দূর করিয়া একাকী এই সব গান গাহিতে গাহিতে দেহের শ্রান্তি দূর করিয়াছি।"

বোমার মামলায় আলিপুর আদালতের কাঠগড়ায় বিপ্লবী আসামীগণকে সমবেত করা হইত। একদিন বিচারক আসার পূর্বে একটি তরুণ বন্দী সহসা রবীন্দ্রনাথের গান গাহিয়া উঠিল: সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।...আদালতের সমস্ত লোক স্তব্ধ হইয়া এই গানটি শুনিল।

(বাংলা দেশের ইতিহাস, আধুনিক যুগ, রমেশচন্দ্র মজুমদার)

২...আমি যখন 'স্বদেশী সমাজ' লিখেছিলুম তখন তৎকালীন কংগ্রেস-ওয়ালারা আমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। বিদেশী গবর্মেণ্টের সঙ্গে অনন্তকাল ধরে রফানিষ্পত্তির কাজকেই তাঁরা ভারতবাসীর মোক্ষসাধন বলে স্থির করেছিলেন। তাঁরা অবজ্ঞা করে বলেছিলেন বেন্থাম প্রভৃতি পণ্ডিতরা স্টেট সম্বন্ধে যে মত প্রচার করেছেন আমি অশিক্ষাবশত সেসব কিছুই জানিনে বলেই এমন কথা বলতে পেরেছি যে প্রজারা নিজেদের শাসনশক্তি নিজেরাই উদ্ভাবন করতে পারে।...বহুকাল থেকে এ কথা বলতে তারা কুণ্ঠিত হয় নি যে দেশের সুখ দুঃখ সম্বন্ধে উদাসীন থেকে আমি কেবল বিদেশের সঙ্গে সখ্যস্থাপনের জন্যে ব্যস্ত। তারা জানে অথবা জেনেও জানে না যে বিদেশের জনসভায় বিদেশী সভ্যতা সম্বন্ধে আমি যা বলে থাকি তা একেবারেই শ্রুতি-সুখকর নয়। (৪ কার্তিক,১৩৩৯, হেমন্তবালা দেবীকে চিঠি, চিঠিপত্র ৯ম খণ্ড)

৩ইংরেজের অত্যাচার সহ্য করতে হবে কিম্বা ভারতবর্ষ কোনদিন স্বাধীন হবার চেষ্টা করবেনা এমন কথা আমি বলিনি। মহাত্মাজী বলেছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই আমরা থাকব এবং সে রকম থাকবার ইচ্ছা না করা religiously wrong অর্থাৎ ধর্মবিরুদ্ধ। আমি তা বলি নে। আমি বলি স্বাধীনতা বাইরের কোন একটা ঘটনার উপর নির্ভর করে না; দেশের যে অবস্থা ঘটলে স্বাধীনতার মূলপত্তন হয়, স্বাধীনতা সত্য হয় সে অবস্থা ঘটাবার জন্যে চেষ্টা করাই আমাদের বর্তমান কর্তব্য। সে অবস্থা চরকা কেটেও হয় না, জেলে গিয়েও হয় না—তার সাধনা তার চেয়েও কঠিন ও বিচিত্র—তাতে শিক্ষার দরকার এবং দীর্ঘকালের তপস্যা চাই। হঠাৎ একটা কিছু করে বসা তপস্যা নয়। (২২ মাঘ ১৩২৮, কাদম্বিনী দেবীকে চিঠি, চিঠিপত্র ৭ম খণ্ড)

৪তোরা প্রাণ খুলে বল বন্দে মাতরম্।
তোদের ঘুমের নেশা ভাঙ্গিয়ে দিলে
ক্ষুদিরামের একটি বম্।

(রমেশচন্দ্র মজুমদারের ইতিহাসে উল্লিখিত)

৫...আমরা মননের আবহাওয়ার মধ্যে জন্মাই নি—যে দেশে সকল ভাবনা ভাবিত এবং সকল কর্ম কৃত হয়ে চিরদিনের জন্যে খতম হয়ে গেচে সেই "আমার জন্মভূমি"তে আমরা মানুষ। (প্রমথ চৌধুরীকে চিঠি, ২ ফাল্গুন ১৩২৪, চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড)

৬... জরুরি চিঠি জরুরি প্রবন্ধ সমস্ত ঠেলে রেখে মাঝে মাঝে প্রায়ই গান লিখি। যখন লিখি তখন মনে হয় স্বরাজ ব্যাপারটা এমন কিছু গুরুতর জিনিষ নয়—মানুষের ইতিহাসে অনেক স্বরাজ বুদ্বুদের মত উঠেচে আর ফেটে গেছে—কিন্তু যে গানগুলোকে দেখতে বুদ্বুদের মত তারা আলোর বুদ্বুদ নক্ষত্রের মতই। সৃষ্টিকর্তার খেলনাগুলির সঙ্গে তাদের রঙের মিল আছে। সেইজন্যেই যখন তারা গড়ে উঠতে থাকে তখন কর্তব্য ভুলে যাই। অথচ দেশের কর্তাব্যক্তিদের কাছ থেকে হুকুম আসচে যে, "সময় খারাপ অতএব বাঁশি রাখ, লাঠি ধর।" যদি তা করি তাহলে কর্তারা খুসি হবেন, কিন্তু আমার এক বাঁশিওয়ালা পিতা আছেন কর্তাদের অনেক উপরে, তিনি আমাকে একেবারে বরখাস্ত করে দেবেন। কর্তারা বলেন, 'তিনি আবার কে? এক ত আছে বন্দেমাতরং।" তাঁদের গড় করে আমাকে আজ বলতে হচ্চে—'আমার

বন্দেমাতরং ভুলিয়েচেন ঐ তিনি। আমি দেশছাড়া ঘরছাড়ার দলে। আমি ভূগোলের প্রতিমার পাণ্ডাদের যদি আজ মানতে বসি তাহলে আমার জাত যাবে। (১৮ কার্তিক, ১৩২৮, প্রমথ চৌধুরীকে চিঠি)

৭"…অদ্য কঠিন ব্রতনিষ্ঠ বঙ্গভূমির প্রতিনিধিস্বরূপ সেই কয়জন এই দুঃসহ অগ্নিপরীক্ষার জন্য বিধাতা কর্তৃক বিশেষভাবে নির্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহাদের জীবন সার্থক। রাজরোষরক্ত অগ্নিশিখা, তাঁহাদের জীবনের ইতিহাসে লেশমাত্র কালিমাপাত না করিয়া বার বার সুবর্ণ অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে। —বন্দে মাতরম্।"

(১৩৩২ ফাল্গুন, ভাণ্ডার, স্বদেশীদের উপর পুলিশের অত্যাচার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ)

প্রবাদ প্রসঙ্গ

সুধীর করণ

সংস্কৃত ভাষায় যার নাম প্রবচন, বাংলা ভাষায় তার-ই নাম প্রবাদ। বলা চলে, "যার নাম চালভাজা তারই নাম মুড়ি"। সংস্কৃত প্রবচন-কে পরিহার করে প্রবাদ নামের অধিগ্রহণের মূলে সম্ভবতঃ ইংরাজী 'প্রোভার্ব' শব্দ। বাঙ্‌লার লোকভাষায় 'প্রবাদ' শব্দটি আজও তেমনভাবে স্বীকৃত নয়। কোথাও বলে 'ডাকের বচন', কোথাও বা 'ছড়া'। প্রবাদ প্রয়োগের সময় কোথাও কোথাও বলা হয়—'কথায় বলে' কিংবা শুধু 'বলে'।[১] ইংরাজী ভাষায় যার নাম 'ইডিয়ম্যাটিক ফ্রেজ', বাঙলা ভাষায় তার নাম বিশিষ্ট বাক্যাংশ বা প্রবাদমূলক বাক্যাংশ। এদের জাত-প্রবাদ বলা হয় না; তবু প্রবাদ-বংশে এরা পুরোপুরি অন্ত্যজ নয়। বলাবাহুল্য, প্রবাদ এবং প্রবাদমূলক বাক্যাংশের গুণগত পার্থক্য আছে, তবু এদের একসারিতে স্থান দেওয়া চলে।

লোকভাষা এবং লোকসাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে প্রবাদ এবং প্রবাদমূলক বাক্যাংশের গুরুত্ব সীমাহীন। কারণ, এর মধ্য দিয়েই ভাষা ও সাহিত্যের প্রাণস্পন্দন বিশেষভাবে অনুভব করা যায়। সব প্রবাদই অবশ্য লোকায়ত নয়, লোক-উক্তিও নয়, অনেক প্রবাদই শিষ্ট উক্তি এবং শিষ্ট সমাজে প্রচলিত। এ ধরনের প্রবাদ মূলতঃ সাহিত্যেও ব্যবহৃত হয়। অতএব প্রাথমিকভাবে প্রবাদকে আমরা দুটি প্রশস্তভাগে ভাগ করতে পারি: লোকায়ত এবং সাহিত্যিক। লোকায়ত প্রবাদ লোক-সমাজের সৃষ্টি, লোক

১। সবাই যেখানে দোষী, সেখানে কোন একজনের নামে দোষ দিলে বলা হয়—
'বলে,—সব চড়ুই ধান খায়,
বাবুই পাখীর নামে যায়।'
কিংবা—কারুর অকারণ হামবড়াই ভাব দেখে বলা হয়—
'কথায় বলে—ঘরে নেই ভাত,
কোঁচা তিন হাত।'

সমাজেই তাঁর স্ফূরণ এবং প্রসারণ। অঞ্চলভেদে এদের সংখ্যা অনেক এবং মুখে মুখে এদের অধিষ্ঠান। সাহিত্যিক প্রবাদ মুখ্যতঃ ঋষিবাক্য কিংবা শিষ্টবাক্য। বাঙলা ভাষায় এমন অনেক প্রবাদ আছে, যাদের প্রয়োগক্ষেত্র সীমাবদ্ধ এবং যে-গুলি শিক্ষানির্ভর। সাহিত্যের মধ্যে প্রযুক্ত হয়ে সেই প্রবাদগুলি প্রসারিত হয়েছে। তাদের অনেকগুলিই কোনো নীতিশ্লোকের ভগ্নাংশমাত্র। শিক্ষিতসমাজের মধ্যে প্রচলিত এই সব প্রবাদের প্রয়োগবিধি শিক্ষনীয়। সাধারণ লোকোক্তির অন্তর্নিহিত ভাবের সঙ্গে এইসব শিষ্টোক্তির ভাবগত মিল আছে কিন্তু লোকভাষার ক্ষেত্রে এদের প্রভাব স্বাভাবিক কারণেই অনুপস্থিত।

লক্ষ্য করা যায়, গ্রামীন অশিক্ষিত মানুষের কাছে সেই ধরনের প্রবাদই আন্তরিক ভাবে গৃহীত, যার শব্দাবলী তেমন মার্জিত নয়; অনেকক্ষেত্রে যার মধ্যে শ্লীলতার আবরণও অগ্রাহ্য। তেমন প্রবাদ শিষ্ট সমাজের মানুষ উচ্চারণ করতে সংকোচবোধ করেন।

সংস্কৃত সাহিত্য থেকে আগত অনেক প্রবাদের সঙ্গে শিক্ষিত মানুষের পরিচয় নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সে সব প্রবাদের উৎসভূমির সঙ্গে পরিচয় নেই। আমরা অনায়াসে বলে থাকি, গতস্য শোচনা নাস্তি, পথি নারী বিবর্জিতা, নরানাং মাতুলক্রম, বসুধৈব কুটুম্বকম, রুদ্ধস্য তরুণী ভার্যা, মিষ্টান্নমিতরে জনা, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী ইত্যাদি। কিন্তু এইসব প্রবাদ পুরো এক একটি নীতি-শ্লোকের শেষাংশ মাত্র।[২] কিছু কিছু শিষ্ট উক্তির উৎস অনুসন্ধান করে এক একটি কাহিনীর সঙ্গেও আমাদের পরিচয় ঘটে যায়। যিনি একটু

২ (ক) কৃতস্য করণং নাস্তি
মৃতস্য মরণং যথা।
গতস্য শোচনা নাস্তি
ইতি বেদবিদাং মতম্।

(খ) আসনং চালয়েৎ দৃষ্ট্বা
পথি নারী বিবর্জিতা।
জাগরণে ভয়ং নাস্তি
অতি ক্রোধো নিবার্যতে॥

(গ) কন্যা বরয়তে রূপং
মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতম্।
বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি
মিষ্টান্নমিতরে জনা।

(ঙ) আত্মবুদ্ধি শুভকরী
গুরুবুদ্ধিবিশেষতঃ।
পর বুদ্ধিবিনাশায়
স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয়ংকরী॥
ইত্যাদি

(ঘ) গো রক্ষী সহদেবশ্চ
নকুলো হয় রক্ষকঃ।
কৈরাটে কুরুরায়াদৌ
নরাণাং মাতুলক্রমঃ॥

লেখাপড়া জানেন, তিনি অনায়াসে প্রয়োগ করেন "অন্নচিন্তা চমৎকারা।" অন্নের চিন্তায় ব্যস্ত থাকলে অন্য চিন্তা যে অসম্ভব, এই কথাই, উক্ত প্রবাদের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। পুরো শ্লোকটি—"দরিদ্রস্য গুণাঃসর্বে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ। অন্নচিন্তা চমৎকারা, কাতরে কবিতা কুতঃ"—কবি কালিদাসের নামে প্রচলিত। এই শ্লোকের মধ্যে দরিদ্র কবির দীর্ঘনিশ্বাস বিধৃত। কথিত আছে,—একদিন কবি কালিদাস, রাজা বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। হঠাৎ কবিপত্নী এসে কবিকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে 'ভাঁড়ে মা ভবানী' অর্থাৎ 'চাল বাড়ন্ত।' কালিদাস কোন উত্তর না দিয়ে রাজসভার দিকে এগিয়ে গেলেন। মনের মধ্যে পুষে রাখলেন—চাল নেই, চাল নেই। রাজসভায় আসন গ্রহণ করার পর মহারাজ বিক্রমাদিত্য কবি কালিদাসকে কয়েকটি সমস্যা দিয়ে তা পূরণ করতে বললেন। কালিদাসের কোন উত্তরই রাজাকে সন্তুষ্ট করতে পারলো না। বিক্রমাদিত্য বিস্মিত হয়ে বললেন, কি ব্যাপার কবি কালিদাস! এমন এলোমেলো জবাব দিচ্ছেন কেন? কালিদাস ঐ শ্লোকটি রচনা করে শোনালেন, যার অর্থ দরিদ্রের গুণ ভস্মে ঢাকা আগুনের মত (সে জ্বলতে পারে না); অন্নচিন্তাই বড় চিন্তা;—তেমন চিন্তায় যে কাতর তেমন মানুষের কাছে কবিতা কি আসে!

স্মরণ করা যেতে পারে বাঙলা সাহিত্যে অতি প্রযুক্ত এবং শিষ্টসমাজে বিশেষভাবে ব্যবহৃত সেই শ্লোকাংশ—'প্রহারেণ ধনঞ্জয়', যার সম্পূর্ণতার জন্য —নিম্ন শ্লোকটিকে গ্রহণ করতে হয়—"হবির্বিনা হরির্যাতি বিনা পীঠেন মাধবঃ। কদন্নৈঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ।" এর কাহিনী উৎস সাধারণ-ভাবে অনেকেরই পরিজ্ঞাত। হরি, মাধব, পুণ্ডরীকাক্ষ এবং ধনঞ্জয় এই চার সহোদর ভ্রাতা শ্বশুর বাড়ীতে মৌরসীপাট্টা গেড়ে 'নট নড়ন চড়ন' অবস্থায় অবস্থান করছিল। ওদের শ্যালকবর্গ নিরুপায় হয়ে, ওদের বিতাড়িত করার জন্য প্রথম তিনের ক্ষেত্রে ভদ্রজনোচিত উপায় অবলম্বন করেছিল। প্রথম জামাতা হরিকে বিতাড়িত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়নি। একদিন ঘি না পেয়েই সে বিদায় নিল মান বাঁচাবার জন্য। অন্য তিনজন কিন্তু ঘি-এর ব্যাপারে তেমন ক্ষুণ্ণ হয়নি। তারা যথাপূর্বং থেকেই গেল। একদিন কাউকে আর পিঁড়ি পেতে দেওয়া হয়নি, বিনা পিঁড়িতেই ভোজনপর্ব। এর ফলে মাধব নামক জামাতা শ্বশুরবাড়ী ছাড়লো। বাকী দুজন এসব

তুচ্ছ কারণে অভিমানী হয় নি। এর পরে ওদের দুজনকে যে ধরনের খাবার দেওয়া হলো, সে ধরনের খাবার খেয়ে কোন জামাই থাকতে পারে না। অন্তত পুণ্ডরীকাক্ষ পারে নি। পেরেছিল ধনঞ্জয়। তাই শেষ পর্যন্ত শালকবর্গ শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলো, যার নাম প্রহার। সেই প্রহারলাভ করে তবে ধনঞ্জয় শ্বশুরালয় থেকে নিষ্ক্রান্ত হলো।

প্রবাদ উৎসে এ ধরনের প্রচুর কাহিনী বর্তমান। হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, মহাভারত প্রভৃতি চিরায়ত সাহিত্য থেকে গৃহীত অনেক প্রবাদের মূলেই বিভিন্ন কাহিনী বর্তমান। সংস্কৃত থেকে বেশ কিছু প্রবাদ বাঙ্‌লা ভাষায় সরাসরি এসে বাঙলা প্রবাদ রূপে চিহ্নিত হয়ে গেছে। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি পরিচিত বাঙলা প্রবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে: "বুদ্ধি যার বল তার",[৩] দশচক্রে ভগবান ভূত,[৪] সসেমিরা, কা চিন্তা মরণে রণে, বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস, অন্নচিন্তা চমৎকারা, কালিদাস বুদ্ধিহারা।

বলা বাহুল্য এ সব মোটেই লোকোক্তি নয়। খাঁটি বাঙলা প্রবাদের চেহারাই আলাদা। বাঙলা ভাষার বিভিন্ন উপভাষিক অঞ্চলের সংখ্যাহীন প্রবাদ এখনও আমাদের অজ্ঞাত। প্রত্যেক অঞ্চলের প্রবাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে এবং সর্বাঙ্গীনভাবে বাঙলা গ্রামীন প্রবাদের মধ্যে যে তীক্ষ্ণতা এবং গতিবেগ আছে—তা সাহিত্যিক বা শিষ্ট প্রবাদে সহজলভ্য নয়। সাধারণ মানুষের রসনা তাদের অবস্থিতির জায়গা নয়।

প্রবাদের চরিত্র সম্পর্কে নানাভাবে নানা কথাই বলা যায় কিন্তু একটি সূত্রে তার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে হলে বলা যায়,—প্রবাদ হচ্ছে লোকসমাজের হাজার অভিজ্ঞতার নির্যাসবাক্য। যাঁরা একে 'ভগবৎ-উক্তি' নামে অভিহিত করেছেন তাঁদের উক্তিও সুভাষিত।[৫] বেকনের উক্তি অবশ্য

৩। বুদ্ধির্যস্ত বলংতস্ত
নির্বুদ্ধেস্তু কুতঃ বলম্
পশ্য সিংহো মদোন্মত্তঃ
শশকেন নিপাতিত।

৪। চক্রং সেব্যং নৃপঃ সেব্যো
ন সেব্যঃ কেবলং নৃপঃ।
অহো চক্রস্ত মাহাত্ম্যাং
ভগবান ভূততাং গতঃ

৫। A proverb is the voice of God.

অনেক বেশী বাস্তব। তাঁর মতে, একটি জাতির প্রতিভা এবং বৈদগ্ধ্যকে ধারণ করে তার প্রবাদ।[৬] আরও বলা হয়, "প্রবাদ একজনের বুদ্ধিদীপ্ত বাক্য যার মধ্যে বহু মানুষের প্রজ্ঞা।"[৭] যে ভাবেই প্রবাদের সংজ্ঞা দেওয়া হোক্‌না কেন, প্রবাদ কিন্তু মূলতঃ লোকায়ত চেতনা থেকেই উদ্ভূত। লোকসমাজের মধ্যে যে চিরায়ত, প্রবহমান অভিজ্ঞতা বর্তমান, প্রবাদ তারই স্বল্পবাচী বাকারূপ অথচ তার ধর্ম হচ্ছে বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর স্বাদ পাইয়ে দেওয়া। এ হচ্ছে এক ধরনের লোকায়ত কবিতা।

প্রবাদ মূলতঃ জাতীয় কিংবা আঞ্চলিক হলেও, তাঁর মধ্যে আন্তর্জাতিক ভাবনার প্রকাশও থাকে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নানা বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও কতকগুলি প্রাকৃতিক ধর্ম এবং সমাজব্যবস্থার সমতার ফলে কিছু কিছু অভিজ্ঞতার ঐক্য দেখা দেয়। ফলে একই ধরনের প্রবাদও বিভিন্ন দেশে উদ্ভূত হতে পারে। শুধু তাই নয়, অভিজ্ঞতার সমতা থাকলে, এক দেশের প্রবাদ অন্য দেশের ভাষায় গৃহীত হয়ে সেই দেশের প্রবাদরূপেই পরিগণিত হয়ে যায়।

যাইহোক—প্রবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাথমিকভাবে মনে রাখা দরকার যে, প্রবাদ এবং প্রবাদমূলক বাক্যাংশের মধ্যে আন্তরিক যোগসূত্র থাকলেও প্রবাদমূলক বাক্যাংশ সাধারণতঃ কোন নীতি প্রকাশ করে না। প্রবাদ-বাক্যও মূলতঃ নীতিবাক্য নয়; তবু ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে নীতিবাক্য সেখানে অপাঙ্‌ক্তেয় নয়। বরং বলা চলে একজাতীয় প্রবাদ নীতি-প্রচারণার জন্যই বলা হয়ে থাকে। আসলে প্রবাদ হচ্ছে কখনও সুভাষণ, কখনো অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য; কখনও বা ব্যঙ্গাত্মক। প্রবাদ কখনও দেয় নির্দেশ, কখনও উপদেশ। (অবশ্য ইংরাজীতে যাকে বলে 'হাইমর‍্যাল' তেমন উচ্চমার্গীয় উপদেশের সঙ্গে প্রবাদের কোন সম্পর্ক নেই।) প্রবাদ কখনো ঘটনার উল্লেখ করেই খালাস; কখনও তার রূপকার্থ প্রকট।

প্রবাদ নিছক লোকশ্রুতি। তাই তাঁর পরিবর্তন ঘটেছে অনেক। কোন সময় কোন একজন বিশেষ ব্যক্তির মুখ থেকে তার জন্ম কিন্তু তার সত্যতা এবং গভীরতা জনমানসের অনুভূতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ এবং একাত্ম

৬। The genius wit and spirit of a nation are discovered by their proverbs.

৭। The wit of one man and the wisdom of many.

বলে তা' ক্রমশঃ মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে লোকসমাজের সম্পদ হয়ে দাঁড়ায়। নিছক সত্য ঘটনা কোন দিনই প্রবাদ হয় না। সত্য ঘটনা যখন রূপকোক্তির চেহারা নেয় তখনই তার মধ্যে প্রবাদের দ্যুতি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। রসে-সিক্ত উজ্জ্বল একটি প্রবাদ যথাস্থানে যিনি প্রয়োগ করতে পারেন, তিনি যথার্থ রসিক।

লোকব্যবহারের দিকে দৃষ্টিপাত করেই সংখ্যাহীন প্রবাদের জন্ম। বাঙলা ভাষায় সামগ্রিকভাবে প্রবাদের সংখ্যা কত তা' এখনও নির্ধারিত হয় নি শুধু তাই নয়, সাধারণভাবে ব্যবহৃত অনেক প্রবাদের প্রয়োগবিধি আমাদের পরিজ্ঞাত হলেও সেই প্রবাদের উৎস সন্ধানে আমরা আজও যাত্রা করিনি। কিছু কিছু প্রবাদের জন্মলগ্নের কাহিনী জানা গেছে কিন্তু তার যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহের কারণও বর্তমান। একথা অবশ্য মেনে নিতেই হয় যে, সব প্রবাদই কাহিনীমূলক নয়, বরং অধিকাংশই অভিজ্ঞতামূলক। তবু 'বামুন বাদল বান, দক্ষিণা পেলেই যান' এই প্রবাদ বাক্যের সঙ্গে 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই' প্রবাদটির পার্থক্য আছে। বামুন বাদল বান সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে তা অভিজ্ঞতালব্ধ। পুরোহিত তাঁর যজমানের কাছ থেকে কাজের শেষে দক্ষিণা লাভ করেন এবং স্বগৃহে যান; দক্ষিণা বাতাসের প্রবাহ সুরু হলেই বুঝতে হবে বাদল এবং বন্যার নিরসন ঘটবে। কিন্তু চোরে চোরে "মাসতুতো" ভাই কেন? পিসতুতো ভাই হ'তে আপত্তি ছিল কোথায়? এ ধরনের উদ্ভট চিন্তা অনেক সময় উদ্ভটও হতে পারে, যদিনা কোনরূপে তার উৎসে পৌঁছে কিছু একটা অবলম্বন পাওয়া যায়।[৮] কিন্তু সে অবলম্বনও কতখানি যথার্থ সে বিষয়েও সন্দেহ জাগতে পারে। তবু, মনকে প্রবোধ দেবার মত একটি কাহিনী পেলে আমরা খুশী হই।

৮। এ বিষয়ে একটি প্রচলিত কাহিনীতে বলা হয়েছে—একবার চারজন চোর এক গেরস্থের কিছু তৈজসপত্র চুরি করে পালাবার সময়, ভোর হয়ে আসছে দেখে,—পাশের আস্তাবল থেকে এক সহিসের খাটিয়া চুরি করে, তার উপর তৈজসপত্র চাপিয়ে একটা চাদর ঢাকা দিয়ে, 'বল হরি হরিবোল' বলতে বলতে খাটিয়াটিকে কাঁধে তুলে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। পথে এক ঝানু চোরের সঙ্গে ওদের দেখা হয়ে গেল। ঝানুচোর বললো,—'ঐ যে গাড়ু দেখা যাচ্ছে!' ধরা পড়ার ভয়ে চার চোর ওকে বললো—'ভাগ চাও তো, এসো।' এর অর্থ দুই-ই হয়; চোরাই মালের ভাগ নেবে তো এসো, কিংবা মড়া নিয়ে যেতে সাহায্য কর। ঝানু চোর খুশী হয়ে বললো, 'কবে মরেছে মেসো?' এই বলে সেও কাঁধ লাগালো।—এই হচ্ছে 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই' নামক প্রবাদের উৎস।

এখন যদি এইভাবে প্রশ্ন করা যায়, হরি ঘোষের গোয়ালের উৎস কোথায় কিংবা 'আষাঢ়ে গল্পে'র উদ্ভব কোথায়, জগা খিচুড়ির মানে কী, পর্বতের মূষিক প্রসব কোন্ কালের ঘটনা,—ইত্যাদি, তা' হলে অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের নির্বাক থাকতে হয়। হাটে হাঁড়ি ভাঙার প্রয়োগ অনেকেরই জানা, কিন্তু কোন্ হাটে কখন কারা হাঁড়ি ভেঙেছিল, কেউ বোধহয় জানে না। বলা বাহুল্য এভাবে গবেষণা করে অনেক প্রবাদের উৎসে আমরা পৌঁছুতে পারি নি। শুধু তাই নয়, বাঙলা সাহিত্যের কোন্ গ্রন্থে প্রথম কোন প্রবাদটি প্রযুক্ত হয়েছিল, কিংবা কোন্ প্রবাদের সম্ভাব্য উদ্ভবকাল কখন, এইভাবে এখনও আমরা আলোচনার জন্য প্রস্তুত হতে পারিনি। পৌরাণিক কাহিনী থেকে উদ্ভূত প্রবাদগুলির উৎস পুরাণেই আবিষ্কার করা যায়, কিন্তু অনেক লোকায়ত প্রবাদের বা প্রবাদ-সম বাক্যাংশের মূলে যে সব লৌকিক কাহিনী বর্তমান, তার সন্ধানে আমাদের যাত্রা করা উচিত। আমড়াগাছী না করে 'আমগাছী' করলে কি ক্ষতি হতো? হাতী রোগ না হয়ে ঘোড়া রোগ হলো কেন? আবার, ঘোড়া-রোগেই গরু মরে কেন? ঘোড়ার ডিম কেমন বস্তু? গদাই লস্করী চাল-এর গদাই লস্কর কে ছিল? তার চাল-টাই বা কেমন ছিল? ভূতের বাপের শ্রাদ্ধটা হলো কোথায়? ষণ্ডামার্কা কি ষাঁড়ের সঙ্গে সম্পর্কিত!

বলাবাহুল্য, এ জাতীয় সংখ্যাহীন প্রবাদের বা প্রবাদ-সম উক্তির মূলে কোন-না-কোন কাহিনী থাকা সম্ভব এবং আছেও। কয়েকটি কাহিনী তুলে ধরা যাক। "ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যাওয়ার" কথা আমরা সবাই জানি যার অর্থ দলের মানুষের দলে ভিড়ে যাওয়া। কিন্তু কই মাছ কেন? অন্য মাছও তো ঝাঁকে ঝাঁকে থাকে! এ বিষয়ে যে কাহিনী আছে তার সত্য মিথ্যে জানার উপায় নেই তবু তার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সন্দেহ না করেই বলা চলে,—

> একবার এক গোঁসাই ঠাকুর একজন ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর এক ধনী শিষ্যের বাড়ী গিয়েছিলেন। ভৃত্যটি একটু রাগী প্রকৃতির। ধনী শিষ্য গুরুর আহারাদির জন্য ডিমভরা বড় বড় কই মাছ এনেছিল। গোঁসাইঠাকুর রন্ধনকার্য শেষ করে নিজের ভাত বেড়ে নিলেন এবং ভৃত্যকেও একটি থালায় বেড়ে দিলেন। ভৃত্য দেখলো, তার পাতে একটি মাত্র ছোট কই মাছ আর গোঁসাই ঠাকুরের পাতে বড় বড় আট দশটি। রাগী ভৃত্য তার নিজের

পাতের ছোট কই মাছটি তুলে ঠাকুরের পাতে ছুঁড়ে দিয়ে বললো, —"যা, ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যা।" ফলে সব মাছই জুটলো ভৃত্যের কপালে।

অবশ্য এমন প্রবাদের সংখ্যাই বেশী যা কাহিনীমূলক নয়। জন, জামাই, ভাগনা, তিন নয় আপনা; যদি হয় সুজন, তেঁতুল পাতায় দুজন; কিংবা যার ছেলে যত পায়, তার ছেলে তত খায়—; যার খাই নুন, তার গাই গুণ; লাভ লোকসান জেনে, চাষ না করে বেনে; ইত্যাদি সংখ্যাহীন অভিজ্ঞতালব্ধ উক্তির জন্মলগ্নে কোন কাহিনী না থাকার সম্ভাবনাই প্রবল।

স্থানীয় ঘটনা এবং সামাজিক প্রথা কিংবা আচার সম্পর্কিত অনেক প্রবাদের মূলেও অনেক কাহিনী থাকে। ইতিহাস থেকেও আহরণ করা হয় অনেক প্রবাদ। শায়েস্তা খাঁর আমল, ধান ভানতে মহীপালের গীত, সিংএর মধ্যে সিং, গঙ্গাগোবিন্দ সিং, নবাব খাজা খাঁ কিংবা ঐ ধরনের অনেক প্রবাদের উৎসে পৌছানো সহজ। কিন্তু পূর্বসূত্র ধরেই আবার যদি প্রশ্ন করা হয়, হরিঘোষের গোয়াল খ্যাত হরিঘোষ কে ছিল? এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। হরিঘোষ যেই থাক না কেন, তাঁর গোয়ালের বর্তমান অর্থ—বিশৃংখলা। এই প্রবাদটি কিন্তু ঐটুকুতেই সম্পূর্ণ নয়—পূর্ণাঙ্গ প্রবাদসম বাক্যটি ছিল 'হরিঘোষের গোয়ালে আগল নেই।' বোঝা যায়, হরি ঘোষ নামক কোন এক গৃহস্থের গোয়ালে আগল না থাকার ফলে, গোরুরা ইচ্ছেমত আসতো যেতো। যার পরিণাম বিশৃংখলা। কোন গেরস্তর বাড়ীতে শৃঙ্খলার অভাব থাকলে এই প্রবাদ প্রযুক্ত হয়।

কিন্তু কুড়ের বাথান বৈদ্যনাথ-এর উৎস কোথায়? তীর্থভূমি বৈদ্যনাথে! বাথানে গোরু মোষ থাকে; খায় দায়, আর শুয়ে শুয়ে জাবর কাটে। বৈদ্যনাথধাম কিন্তু কুড়ের বাথান হলো কি করে! এই উক্তি কি নিষ্কর্মা পাণ্ডাদের সম্পর্কিত! নাকি অন্য কোন রূপকার্থ আছে!

"রতনবাবুর নাতি স্বর্গে দেবে বাতি।" কোন্ রতন বাবু!

আর একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। সহজ ব্যাপারকে জটিল করে তুললে বলা হয় "চিঁড়ার বাইশ ফের।" বলা হয় বটে, কিন্তু ব্যাপারটি যেমন জটিল তেমন জটিলই থেকে যায়। কিভাবে কোথায় কখন এর উদ্ভব ঘটলো কে জানে, তবে চিঁড়ার বাইশ ফেরে দু-তিন মণ চিঁড়ে পাওয়া যেতে পারে। কি ভাবে হতে পারে দেখা যাক্—

দাঁড়িপাল্লার এক পাল্লায় একটি চিঁড়ে অন্য পাল্লায় একটি চিঁড়ে রেখে, দুটি চিঁড়েকে একত্রে বাঁ দিকের পাল্লায় রেখে আবার ডান দিকের পাল্লায় দুটি চিঁড়ে রেখে, তাদের আবার বাঁ পাল্লায় এনে, ডান পাল্লায় সমপরিমাণ চিঁড়ে রেখে—এবং এইভাবে বাইশবার ঘোরাফেরার চক্রে পড়ে মোট চিঁড়ের পরিমাণ দাঁড়াবে ৪১৪৭০৩।

একেই বলে চিঁড়ের বাইশ ফের!

কিন্তু সত্যি কি, 'চিঁড়ের বাইশ ফের'-এর উৎস এই ব্যাপারটি! না অন্য কিছু!

যাইহোক—এইসব লোকায়ত প্রবাদ খুব বেশী অর্থবহ এবং এদের চমৎকারিত্বও অসাধারণ। পৌরাণিক-উৎস সঞ্জাত প্রবাদগুলি সাধারণতঃ অশিক্ষিত গ্রামীন জনসমাজে ব্যবহৃত হয় না। তবু তেমন কিছু কিছু প্রবাদ সেখানেও কালক্রমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। লক্ষ্মণ ভাই, কানাই ভাগনে, বিন্দেদূতী, শিবরাত্রির সল্‌তে, নারদের ঢেঁকি, রাবণের চিতা, ঠুঁটো জগন্নাথ, গোকুলের ষাঁড় প্রভৃতি এই জাতীয় উদাহরণ।

ঈশপের কাহিনী থেকে কিংবা বিদেশী নীতি গল্প থেকে ইংরাজী ভাষার মধ্য দিয়ে যে সব প্রবাদ বাঙ্‌লা ভাষায় গৃহীত হয়েছে তাঁদের উৎস অনাবিষ্কৃত নয়। পর্বতের মূষিক প্রসব, বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধা, আঙ্গুর বড় টক, সিংহ ভাগ, দুর্জনের ছলের অভাব হয় না—ইত্যাদি প্রবাদ যে মূলতঃ ইংরাজী থেকে প্রাপ্ত তাও আমরা জানি।[৯] ঈশপ যদিও ভারতীয়

৯। ইংরাজী ভাষায় এমন অনেক প্রবাদ কিংবা 'ইডিয়মেটিক ফ্রেজ'—(প্রবাদ-সম বাক্যাংশ) প্রচলিত, যে-গুলি ঈশপের কাহিনী সঞ্জাত। উদাহরণ:—

Grapes are sour.
Look before you leap.
The mountain in Labaus.
Familiarity breeds contempt.
Spare the rod and Spoil the child.
To bell the cat ইত্যাদি।

ঈশপের কাহিনী সঞ্জাত অনেক প্রবাদই ইংরাজী থেকে ভাষান্তরিত হয়ে বাঙলা ভাষাতেও স্থায়ী আসন লাভ করেছে। এই প্রসঙ্গে পর্বতের মূষিক প্রসব নামক প্রবাদসম উক্তির কাহিনীটি ব্যক্ত করা হচ্ছে:

"অনেক দিন আগের কথা। একবার এক পর্বতের ভিতর থেকে, এক চাপা গুমরানো গোঙানির মত আওয়াজ শুনতে পেলো পর্বতাঞ্চলের লোকজন। সবাই ভাবলো,—হচ্ছেটা কি! কে একজন বললো—পর্বতের গর্ভ যন্ত্রণা। ব্যথা উঠেছে। কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেল চারদিকে। দলে দলে লোক ছুটলো এই ঘটনা দেখার জন্য। সবাই উৎসুক—পর্বতের গর্ভ থেকে কি বস্তু প্রসবিত হয়; কে জানে! অনেক জল্পনা কল্পনা। হঠাৎ দেখা গেল, পর্বতের পাশে তুড়ুক করে লাফিয়ে উঠলো এক ইঁদুর।

পঞ্চতন্ত্র, জাতক, হিতোপদেশ এবং মহাভারতের কাছে বিশেষ ভাবে ঋণী, তবুও একথা স্বীকার করতেই হয় যে উপরিউক্ত প্রবাদগুলি ঈশপের কাছ থেকেই আমরা পেয়েছি।

এই সব প্রবাদ সাহিত্যিক প্রবাদ রূপেই স্বীকৃতি লাভ করে শিষ্ট সমাজের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করেছে। লোকায়ত সমাজে এদের কোন প্রভাব নেই।

আগেই বলেছি, যেসব বাঙলা প্রবাদ একান্তরূপে লোক সমাজের এবং যাদের মধ্যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বর্তমান তাদের অনেকেরই উৎস কাহিনী নিশ্চয়ই আছে। তাদের অনেকের সন্ধান হয়তো পাওয়া যায়, তবু অনেক প্রবাদের গোড়ার কথা আমরা একেবারেই জানি না। যে সব প্রবাদ আমাদের জানা, তাদের সম্পর্কে যদি এই ভাবে প্রশ্ন করা যায়—

কার আক্কেল গুড়ুম হলো ?
আক্কেল সেলামী কেমনতর ?
কার বাড়ীতে আমড়া কাঠের ঢেঁকি ছিল ?
কেঁচে গণ্ডুষের উৎস কি ?
শ্রাদ্ধ কোথায় গড়িয়েছিল ?
গোঁফখেজুরের বাসা কোথায় ?
খাল কেটে কে কুমীর আনে ?
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে—
ব্যাপারটা কি ?
ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ কোথায় ? ইত্যাদি—

তা'হলে নিশ্চয়ই একটু ভাবতে হয়। বলা বাহুল্য আমাদের গবেষণা এ বিষয়ে এখনও তেমন তৎপর নয়। আমাদের অপরিচিত সংখ্যাহীন আঞ্চলিক প্রবাদ এখনও তেমন ভাবে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নি। লোকভাষা চর্চার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রবাদ সংগ্রহ এবং তাঁর উৎস সন্ধান করা এই মুহূর্তেই সুরু করা উচিত। ইংরাজী ভাষায় প্রচলিত প্রবাদের উৎস সন্ধানের কাজে যে ভাবে দৃষ্টিপাত করা হয়েছে, সে ভাবে বাঙলা প্রবাদের উৎস সন্ধানেও আমাদের ব্রতী হওয়া কর্তব্য।

ইংরাজী যখন থেকে এ দেশেও শিক্ষনীয় ভাষার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করলো, তখন থেকে অনেক ইংরাজী প্রবাদও সরাসরি ভাষান্তরিত হয়ে

বাঙ্‌লা ভাষায় প্রবেশ করলো। অবশ্য তাঁর ব্যবহার সীমাবদ্ধ থাকলো শিক্ষিত জনের মধ্যেই। আবার এমন অনেক প্রবাদও বাঙ্‌লা ভাষায় ছিল, যার সঙ্গে কোন কোন ইংরাজী প্রবাদের মানস ধর্মের মিলও ছিল। তেমন ক্ষেত্রে ইংরাজী প্রবাদের অনুবাদ আর আক্ষরিক হলো না, হলো ভাবগত। এ ছাড়া শিক্ষিত জনের মুখে অনেক ইংরাজী প্রবাদই এমন ভাবে গেড়ে বসলো যে তাদের বঙ্গানুবাদ তেমন ভাবে জোরালো হয়ে উঠতে পারলো না। বলা বাহুল্য লোকায়ত সমাজের সঙ্গে এ জাতীয় প্রবাদের কোন সম্পর্ক নেই। তবু বাঙ্‌লা ভাষায় যাদের অনুপ্রবেশ ঘটে শিষ্ট সমাজের মধ্যে স্থান লাভ করেছে ইচ্ছে থাকলেও তাদের বর্জন করা সহজ নয়।[১০]

বলা বাহুল্য, যথার্থ বাঙলা প্রবাদ বা যথার্থ ইংরাজী প্রবাদের অনুবাদ হঠাৎ কখনো সম-মানসিকতার প্রভাবে অর্থবহ হয়ে উঠলেও সব সময় তা' হয় না। ইংরাজী রেড লেটার ডে-র বাঙলা যদি হয় 'লালচিঠির দিন' তা' হলে তা' হৃদয়গ্রাহ্য হয় না, কিংবা 'চায়ের পেয়ালায় তুফান তোলা'ও নয়। কিছু কিছু প্রবাদ অবশ্যই আছে—যাদের 'সমানধর্ম' অর্থ গ্রহণের পক্ষে কোন বাধার সৃষ্টি করে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—বাঙ্‌লা প্রবাদ 'অরণ্যে রোদন' এবং ইংরাজী প্রবাদ—ক্রাইং ইন্ ওয়াইল্‌ডারনেস-এর মধ্যে বন আর প্রান্তরের পার্থক্য থাকলেও দুটির মধ্যে ভাবগত মিল

১০। ইংরাজী থেকে সরাসরি অনুবাদ করে নেওয়া কিছু প্রবাদের উদাহরণ :

লৌহ যবনিকা (Iron curtain)
শ্বেতহস্তী (White elephant)
মূর্খের স্বর্গ (Fools paradise)
বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধা (To bell the cat)
আঙুর বড় টক (Grapes are sour)
খোলা মন (Open mind)
চায়ের পেয়ালায় তুফান (Storm in teacup)
এক ঢিলে দুই পাখি মারা (To kill two birds in one stone)
সিংহ ভাগ (Lion's share)
ঘোলা জলে মাছ ধরা (To fish in troubled water)
কুম্ভীরাশ্রু (Crocodiles tears)
চক চক করলেই সোনা হয় না (All that glitters are not gold)

আবিষ্কার করা সম্ভব। কিংবা অর্থম্ অনর্থম্—'অর্থই অনর্থের মূল'-এর সঙ্গে 'মানি ইজ দি রুট অব অল ইভিলস্'-এর সম্পর্কও বেশ রয়েছে।[১১]

এমন অনেক ইংরাজী প্রবাদ আমরা প্রায়ই ব্যবহার করে থাকি যার প্রয়োগ বিধি আমাদের পরিজ্ঞাত কিন্তু তাদের যথাযথ অর্থ কি ছিল আমরা জানি না। এই সব প্রবাদ অবশ্যই পুঁথিগত এবং অনেক প্রবাদের বাঙ্‌লা অনুবাদ করা হলেও কিংবা অনেক প্রবাদের সমধর্মী বাঙ্‌লা প্রবাদ থাকলেও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি বাঙ্‌লা ভাষার সঙ্গে খাঁটি ইংরাজী প্রবাদ ব্যবহার করে থাকেন। ইংরাজীতে একটি প্রবাদ-সম উক্তি হচ্ছে 'টিট্ ফর ট্যাট্' যার সমধর্মী বাঙ্‌লা প্রবাদ 'ইটের বদলে পাটকেল,' যদিও টিট মানে ইট নয়, ট্যাট মানে পাটকেলও নয়। তবু ধ্বনি সাদৃশ্যে টিটকে ইট করা সহজ হয়েছে। যাই হোক—এই ইংরাজী প্রবাদটি মৃদু প্রতিশোধের ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। ইংরাজী ভাষায় এই লোকোক্তির ব্যবহার মাত্র চারশো বছরের পুরোনো। তার আগে এর চেহারা ছিল—টিপ্ ফর এ ট্যাপ—Tip for a tap. মধ্যযুগীয় ইংরাজীতে টিপ্-এর অর্থ—মৃদু মুষ্ট্যাঘাত অর্থাৎ নরম একটি ঘুষি। ট্যাপ-এর অর্থ আগেও যা ছিল এখনও তাই আছে। এর মানেও নরম ঘুষি। তাই এই প্রবাদটির মৌলিক অর্থ নরম ঘুষির বদলে নরম ঘুষি। হিব্রু ভাষার সেই ভয়ংকর দুটি লোকোক্তি, দাঁতের বদলে দাঁত এবং চোখের বদলে চোখ-এর নির্মম ভাব এর মধ্যে নেই। টিট্ ফর ট্যাট্-এর মধ্যে প্রাথমিক কোমলতা অবশ্যই নেই। এর অর্থ এখন "নির্দয় বাক্যের পরিবর্তে নির্দয় বাক্য প্রয়োগ করা।" জন্

১১। এ ধরনের সমধর্মী প্রবাদের কয়েকটি উদাহরণ :

No Pains no gain : কষ্ট বিনা কেষ্ট মেলে না।

Physician, heal thyself : কামলা আপনি সামলা।

To set a thief to catch a thief : কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা

Might is right : জোর যার মুলুক তার

To add fuel to the fire : জলন্ত আগুনে ঘৃতাহুতি

Let bygones be bygones : গতস্য শোচনা নাস্তি

To add insult to injury : মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা ইত্যাদি

যদি হ্যারিকে 'সারমেয়' বলে তা হলে হ্যারি জনকে 'বরাহনন্দন' বললেই তা হবে টিট্ ফর ট্যাট্। বাঙ্‌লায় এর নাম "মুখের মত জবাব"।[১২]

যে কাহিনী আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হয় তাকে বলি আষাঢ়ে গল্প বা গাঁজাখুরী গল্প। ইংরাজীতে তেমন কাহিনীর জন্য ব্যবহৃত হয়—'কক্ অ্যাণ্ড বুল স্টোরী'। ঘোর বর্ষায় আষাঢ় সন্ধ্যায় ঘরের মধ্যে বসে গ্রামীন লোকেরা নাকি নানা উদ্ভট গল্প বলে সময় কাটাতো। সেইজন্যই ঐ জাতীয় গল্পের নাম আষাঢ়ে গল্প। বলাবাহুল্য এর চেয়ে আর কিছু বেশী আমাদের জ্ঞাত নয়। ইংরাজীতে উদ্ভট গল্প সম্পর্কে ব্যবহৃত 'মোরগ এবং ষাঁড়ের গল্প' নামক লোকোক্তির উৎস সম্বন্ধে যতটুকু জানা গেছে, তাতে মন ভরে না। ফরাসীভাষায় ঠিক এই ধরনের একই ভাবের একটি প্রবাদ আছে "গাধার সামনে মোরগ।" যাই হোক—এ ধরনের অনুমান করা যেতে পারে যে কোন কৃষক যদি অন্য কৃষকদের কাছে তার ষাঁড় আর মোরগের কথোপ-কথনের কাহিনী শুনিয়ে থাকে তা'হলে নিশ্চয়ই উদ্ভট গল্প বলে হেসে উড়িয়ে দিয়ে থাকবে ওরা। অবশ্য এ নিছক অনুমান মাত্র।

বাঙ্‌লা ভাষায় 'রেড্‌লেটার ডে' একেবারে অপরিচিত নয়। শিক্ষিত সমাজে এর প্রচলন ভালোই। কেউ কেউ অনুবাদ করে লালচিঠির দিনও বলেন। এটি প্রযুক্ত হয় স্মরণীয় দিন হিসাবে। এক্ষেত্রে লালরঙের কাগজে লেখা কিংবা লালকালিতে লেখা কোন চিঠির কথা বলা হয় না। বাঙ্‌লা ভাষায় এর সমধর্মী কোন লোকোক্তি নেই। শুধু বলা যেতে পারে—দিনের

১২। এই প্রসঙ্গে চেষ্টারটন ও বার্নাড্‌শ'র নামে প্রচলিত সেই কাহিনীটির স্মরণ করা যেতে পারে। চেষ্টারটনকে মুখের মত জবাব দিয়েছিলেন বার্নাড্‌শ। একবার লণ্ডনের এক সরু গলিপথ দিয়ে যাওয়ার সময় চেষ্টারটন্ দেখলেন সেই পথেই উল্টো দিক থেকে আসছেন বার্নাড্‌শ। শ'-কে নাকি উনি দু-চক্ষে দেখতে পারতেন না। চেষ্টারটন্ ভাবলেন ওকে কিছুতেই রাস্তা ছেড়ে দেবেন না উনি। সেই গলিপথের দু দিকে দেয়াল। কোন একজন দেয়ালের গা ঘেঁসে না দাঁড়ালে আর একজনের সহজভাবে যাওয়া মুস্কিল। বার্নাড্‌শকে দেখে উনি রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগলেন। বার্নাড্‌শ বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। তিনি নিজে গুঁটকো চেহারার মানুষ—, চেষ্টারটন ঠিক তার বিপরীত চেহারার মানুষ,—দারুণ মোটা। শ'এর গায়ে পড়লে শ'এর দফারফা।

বার্নাড্‌শ কাছে আসতেই ভারিক্কী গলায় চেষ্টারটন বললেন—I do not allow the street dogs to pass. বার্নাড্‌শ সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের গা ঘেঁসে দাঁড়ালেন আর চেষ্টারটন দেমাকের সঙ্গে এগিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেলেন শ' বলছেন—I do allow.

মত দিন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংরাজী ভাষায় 'শুভদিন' অর্থে এর প্রয়োগ ছিল। বিশেষ করে যে দিনটিতে কোন সাধুসন্তের স্মরণে উৎসব করা হতো। ক্যালেণ্ডারের পাতায় এই জাতীয় দিনগুলিকে লালকালি দিয়ে চিহ্নিত করা হতো। ছুটির দিনগুলিকে এখনও লালকালির চিহ্নেই চিহ্নিত করা হয়। এক্ষেত্রে লেটার মানে চিঠি নয়।

বর্ষাকালের আকাশ থেকে কুকুর বিড়ালকে ঝুপ ঝুপ করে নেমে আসতে আমরা দেখিনি। অথচ ইংরাজীমতে তাই হয়। আমরা আকাশ থেকে মুষল নামতেও দেখিনি, তবু বলি, মুষলধারে বৃষ্টি। ওরাও বলে ইট্ ইজ রেনিং ক্যাট্স্ অ্যাণ্ড ডগস্। মুষলের মত মোটা ধারে বৃষ্টি পড়ার কথা তবু চিন্তা করা যায়, কিন্তু পালে পালে কুকুর বেড়াল! এই লোকোক্তি প্রয়োগের মূলে আছে বজ্রনাদ, বজ্রপাত, বিদ্যুৎ চমক এবং মেঘের গর্জন। কুকুর পালের বিবাদকালীন আওয়াজ, এবং ক্রুদ্ধ বিড়ালের ফোঁস ফোঁসানীর কথা ঘোর বৃষ্টিতে স্মরণ করা চলে বৈকি!

বাঙলাতে একটি প্রবাদসম উক্তি আছে 'পিটিয়ে লম্বা করা।' বাঙলাতে কি ভাবে এর উদ্ভব ঘটেছে সে বিষয়ে তর্কের অবকাশ আছে। ইংরাজীতে অবশ্য একটি প্রবাদ আছে যাতে পিটিয়ে লম্বা করার কাহিনী আছে। "প্রোক্রাস্টানের শয্যা"[১৩] নামক লোকোক্তির কাহিনীটি বেশ মজার গল্প। গ্রীকপুরাণে বলা হয়েছে—প্রোক্রাস্টান ছিল একজন কুখ্যাত দস্যু। পথের ধারেই ওর আস্তানা। ক্লান্ত পথিক যদি ওর বাসায় একরাতের জন্য আশ্রয় চাইতো, তা'হলে সেই দস্যু আনন্দের সঙ্গেই ওকে আশ্রয় দিতো। ঘরের মধ্যে দুটি শয্যা পেতে রাখতো সে। একটি বেশ লম্বা আর একটি অল্প দৈর্ঘ্যের। অতিথি যদি লম্বা মানুষ, তাহলে তার জন্য বরাদ্দ হতো অল্প দৈর্ঘ্যের শয্যা। তার ফলে, অতিথির পা বিছানা থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়তো আর সেই ডাকাত সঙ্গে সঙ্গে অতিথির পা, বিছানার সমান করে দিতো তরোয়ালের কোপে পা দুটিকে দ্বিখণ্ডিত করে। লম্বা শয্যার বেঁটে মানুষকে বিছানার সমান করতো অন্য উপায়ে। সেই উপায় হচ্ছে পিটিয়ে লম্বা করা। জোর জবরদস্তি করে অবস্থার পরিবর্তন করার প্রসঙ্গে উক্ত ইংরাজী লোকোক্তির ব্যবহার করা হয়।

১৩। Procrustean bed

বাঙলা সাহিত্যে প্রযুক্ত বেশ কিছু পুরাণমূলক প্রবাদ বা প্রবাদসম লোকোক্তির উৎসভূমি পর্যন্ত আমরা পৌঁছে যাই। কিন্তু লোকায়ত প্রবাদের উৎসভূমির সন্ধানে আমরা এখনও খুব বেশি দূরে যেতে পারি নি। এই মুহূর্তেই সে দিকে আমাদের যাত্রা সুরু করা উচিত। এ কথা অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হয় যে অনেক প্রবাদের আদিভূমিতে আমরা কোনদিনই পৌঁছুতে পারবো না, কিন্তু শ্রম স্বীকার করলে অনেক প্রবাদের রহস্যও আমরা উন্মোচন করতে পারবো।

প্রবাদ সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ ইদানীং স্তিমিত। শিষ্টসমাজে প্রবাদ-প্রয়োগ খুবই সীমাবদ্ধ। অথচ প্রবাদের যথার্থ ব্যবহারে সাহিত্য যেমন রসপুষ্ট হয়—তেমনি সাধারণ বাক্যও অসাধারণত্ব লাভ করে। মনে রাখা উচিত যে,—মানুষ যখন কাব্যরচনার কথা চিন্তাও করে নি, তেমন আদিকালে, প্রবাদই ছিল সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত কবিতা।

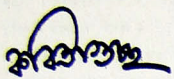

কবিতাগুচ্ছ

শরৎকুমারের কবিতা

পার্থসারথি চৌধুরী

প্রচুর পৌরুষ ও যৌবনসন্তপ্ত উদভ্রান্তিতে যে কবির কবিতা এক সময় আমাদের আক্রান্ত করেছিল, আবার নতুন পর্বে যিনি এক পরিণত বৈরাগ্যের সুস্মিত প্রজ্ঞার সন্ধানে আপাতত নিযুক্ত, সেই শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় প্রথম 'কবিতা অভ্যাস' করেছেন নমিতা মুখোপাধ্যায় ছদ্মনামে। প্রথম কাব্যগ্রন্থের ভূমিকাতেই এই নম্র 'বামাচরণ'কে কাব্যচর্চা তথা হৃদয় চর্চার প্রতিবন্ধক জেনে সক্ষেদে বর্জন করেছেন তিনি।

কিন্তু কবিতা যে হৃদয় চর্চার চেয়ে আরো কিছু বেশি। পুরুষকে যে হৃদয়াবেগ ছাড়াও আরো ভিন্নতর বিপত্তির দাসত্ব করতে হয়, এই সত্য অবশ্য শরৎকুমার তাঁর পরবর্তী কাব্যরচনায় বাঙ্ময় প্রতিবেদনে স্মরণীয়ভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

জীবনানন্দ দাশকে উৎসর্গীকৃত প্রথম পুস্তিকাটিতে (সোনার হরিণ, কৃত্তিবাস প্রকাশনী, ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ) কবি ছিলেন নির্জনসঞ্চারী, হৃদয়বিলাসী। কোনো এক নিরুপমা রায় তাঁর সোনার হরিণ, তিনি কবিতা লেখেন আর এক বিষণ্ণ কবির উদ্দেশে, বিশ্বাস করেন চৈত্র শেষের চৌচির মাঠে কাঠ-চাঁপাদের নিপুণ সজ্জা শুধু একটি কবিতা লিখিয়ে নেবার জন্য। তাঁর শান্তিনিকেতনে মৃদু মন্থর পায়ে সন্ধ্যা নামে। এই নির্জনতাবিলাসের মধ্যে অবশ্য তাঁর একবার মনে হয়েছে কলকাতার পাষাণবুকে তাঁর হৃদয়খানি পাতা।

শরৎকুমার এই অকারণ সাবধানী ভীরুতার পলায়নপরতা থেকে কাব্যের উচ্চকিত ভূমিতে পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয়েছেন পরবর্তী গ্রন্থদুটিতে, যাদের নাম 'র‍্যাঁবো ভের্লেন এবং নিজস্ব' আর 'আহত ভ্রূবিলাস'। প্রথমোক্ত বইটিতে চমৎকার সন্ধানী অনুবাদকর্মের পাশাপাশি আমরা কবির কিছু নিজস্ব কবিতা পেয়েছি। সেগুলোতে সুস্বাদ ছাড়াও অদ্ভুত পৌরুষের ছাপ।

'সর্বনাশ আঁকা ছিল অনন্যার ঠোঁটে আর অলকার চুলে
সর্বনাশ আঁকা ছিল অরুণার নরম আঙুলে।'
(জন্মান্ধ।)

এই সর্বনাশের বোধ আকাঙ্খায় উদ্দীপ্ত হয়ে জীবনের আকর্ষণ বাড়ায়। পদ্মনিভ হৃদয় উন্মুখ হয়। হরিদ্রানয়ন কুটিল শঙ্খিনীর কাছে চুম্বনের নিষিদ্ধ মরণ চাইতে গিয়েও মুখে আর্তরব 'ছুঁয়ে দেখো কতকাল ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে আছি।' (এক সন্ধ্যার প্রার্থনা।) সব দুঃখ রেখে অবসন্ন বালকের মতন ঘুমোবার সাধ হয় তাঁর। একদিকে অস্থির দেহচারণের লিপ্সা, অন্যদিকে করুণা ও শুশ্রূষার জন্য আর্তি—এই দুই মূল সুর সেই থেকে শরৎকুমারের কবিতায় দুই তটের মতো বেগবান বক্তব্যকে রূপ দিয়েছে।

সেই সঙ্গে এসেছে নাগরিকতা। কফির পেয়ালা ঘিরে স্ত্রীচরিত্রবর্জিত দশবন্ধুর আড্ডা—

'এন্তার তামাক পুড়ছে—দগ্ধ বাসনার কুণ্ডলী
* * *
একত্রে মাতাল হই দশ পেয়ালা কফি খেয়ে পাগল দশজনা।'
(দ্বিতীয় চিন্তা।)

'রাত বারোটার পর কলকাতা শাসন করে চারজন যুবক' ট্রামলাইনে অগ্নিকণা, পুলিশের বশংবদ কুর্নিশ, শিকারী দেবতার মদনমৃগয়া। সব এলোমেলো উদভ্রান্তির কোরকে অভিজ্ঞতা, ঝিনুকের মধ্যে পোকার মতো মুক্তা হয়ে যায় ক্রমশ বিস্ময়ে। 'উৎসব' কবিতাতেও সেই নেশাতুর চিত্তবৈকল্যের মধ্যে মুক্তার সন্ধান—

'কালকের প্রমত্ত উৎসবে
বেচারা তার প্রেয়সীকে চিনতে পারেনি।'

এ সময় থেকেই তাড়না থেকে ধারণায়, জুগুপ্সা থেকে প্রেমে, রিরংসা থেকে মাধুরীতে শরৎকুমারের যাত্রা শুরু হয়েছে।

কবির বয়স বাড়ে। 'যৌবনের দ্রুত দিনগুলির উদ্দেশে' নিবেদিত হয় তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ, 'আহত ভ্রূবিলাস'। আরো বেশি নিজস্ব, কবোষ্ণ। আর্তি বাড়ে—'স্পর্শ করো আহত বালকের রুপার মতো চুল।'

আশির বল্মীকে নাড়া চান কবি, জলভারে নতি। 'আহত ভ্রূবিলাস' শরীর সন্ধানক্লান্ত নবোন্মুখ এক হৃদয়ের যুগল প্রেমের যাচ্ঞায় মুখর। রমণের সুখ সীমিত জেনে আরো গভীরতর জানা শোনার জন্য অধীরতা। 'আমি অন্ধারে পা দেবো না পদ্মদি।' (ঘড়ির দোকান ছেড়ে।)

'এবং তোমার
মহিষের পিঠে চড়ে ধুলোগায়ে চলে যাবো ব্যাকুল রাখাল।'
(এবার হবে না ভুল।)

'নীরোম শৈশব' ছেড়ে অরণ্যের মত গাঢ় তপস্বিনী হয়েছে শৈবলিনী। নিবিড়তর পাওয়ার আগ্রহে পুনরায় সুশীতল নদীর ভিতর মাছ হতে চান কবি। মধ্য তিরিশে অন্য সুর লাগে। দেহসুখের বৃন্তে রমনীয় ফললাভ, উৎসব বাড়িতে পূর্ব প্রণয়িনীর কচিটিকে দেখে সবজির মতন অনায়াস জীবনের প্রতিও আগ্রহ জাগে।

পুরোনো নাগরিক মর্ষকাম বিভ্রান্তি এখানেও আছে। সে এক বিচিত্র গাড়ল, চুমাস না লিখলে কেন গায়ে ফোস্কা হয়, দিশী মদ, বেশ্যার থাপ্পড়, 'অন্ধকার গলিতে সটকাও লোকভর্তি ট্রাম ছেড়ে।' এখানেও কবি দেহ-রীতিপটু, তবু এ কেমন যেন এক বিমুগ্ধ লাম্পট্য। এক মুগ্ধ বিরলসম্ভব অমল প্রেমিকের ছবি এখানে ওখানে ভেসে বেড়ায়, রেস্তোরাঁয় বেশ্যালয়ে। (আরেক ছোকরা এসেছিল বুকটা আমার ভাসিয়ে দিল কেঁদে কেঁদে। চন্দ্রালোক।) একদিকে ভয়ঙ্করী রামা, অন্যদিকে অপাপবিদ্ধ প্রেম—এর মধ্যে এক উদ্ভ্রান্ত উদ্ভাসিত পথে পুরুষের টালমাতাল যাত্রা।

'মন্দিরের মধ্যে ফিরে আসছে কোন্ অনার্য দেবতা
জাগ্রত অশিবলিঙ্গ ;
(প্রস্তর পল্লীতে।)

—রিরংসাকে অবহেলা নয়, তার মধ্যে দিয়েই বৃহত্তর প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি। প্রেমকুণ্ঠা নারীর পদাঘাতেও অমেয় মূল্যারোপ—

'যদি না উদ্ধার করো পদাঘাতে, মরে যাবে মন্দিরে ঈশ্বর।'

যেহেতু 'বকুর দিদির মতো উলু দিয়ে চলে গেল আমাদের যৌবন বয়স,' আর মুখ থুবড়ে অশ্লীল সৈকতে ওষ্ঠ ভেজাতে ইচ্ছা নেই, রমণীর সরস গহ্বর

ছেড়ে নিজেকে উদ্ধার করার সময় এসেছে। 'প্রতিদ্বন্দ্বীর' সঞ্জীবন কবিরই অন্য সত্তা। বাহান্নজন স্ত্রীলোক শতকে জেনেও দয়িতাকে অনন্যা মনে হয়। সঙ্গমের নাছোড়পনায় স্নেহ ভিক্ষা করা যায় তারই কাছে বারবার।

'আরো কতবার সঙ্গত হলে রমণী তোমার স্নেহ পাওয়া যায়?
(কৃপণ।)

'খুকী সিরিজে' কন্দর্প কৌতূকাপন্ন দেহমুখ কিশোরী ভজনার মর্মে মেতেছেন তিনি। নীরোম বালিকা ক্রমে ঝুপসী হয়ে আসে। পুরুষ সাধনবিমুখ। তবু এক হাস্যোজ্জ্বল স্বাস্থ্যবতী রহস্যপশারিনী খুকী বারবার ফিরে আসে শরৎকুমারের কবিতায়। ঘাঘরা কেড়ে নিয়ে শাড়ি পরায় কোন চণ্ডাল এই কিশোরী প্রতিমাকে। 'কাঁচা আমটি হারিয়ে এলে কোন বাগানে।' এই অয়মধুর উদ্ভিন্নযৌবনার জন্য ভিখিরি বুড়ো গাছতলায় বসে জ্বরে কাঁপে একা। মিনতির আলখাল্লা ছেড়ে বুড়োটি কখনো কখনো দস্যুর মতো বেড়িয়ে আসতে চায়, 'ঘরের ঢেঁকি কুমীর হয়।' থার্মোমিটার ভেঙে ফেলে জ্বরতাপের অবসান ঘটাতে ইচ্ছে করে। একদিকে দুধ-কুমারীকে ভোগ দখলের প্রাকৃত দস্যুতা, অন্যদিকে রহস্যের দোলাচল—এরি মধ্যে খুকীর সঙ্গে কবির ইতিউতি খেলা, এবং সে খেলা জমেও ওঠে বেশ।

'না নিষাদ' এবং 'কোথায় সেই দীর্ঘ চোখ' ফলবান সুসময়ের পাশাপাশি ফসল। গার্হস্থ্য প্রণয়ের কিংবা প্রণয়হীনতার সঙ্গে লোলুপ মর্ত্যকীটের সম্মানজনক সন্ধি এখানে। বিশ শতকের দম্পতির ক্ষমা প্রার্থনার মধ্যেও গৃহবলিভুক্ প্রণয়ের ফলন্ত সার্থকতার স্বীকৃতি। আবহমানতার সঙ্গে নতুন করে পরিচয় ঘটে এখানে। পিতৃপুরুষ কিছুটা মনোযোগ দাবী করে। নারীর শ্রেষ্ঠতম দান। নিরাভরণ অভ্রসাধিত লাবণ্যচ্ছবি, পেতে মন চায়। সেই সঙ্গে কবিতার আযৌবন সঙ্গিনীটিও নতুন অধিকার নিয়ে উপস্থিত হয়। শিল্প নিয়ে ভাবনাচিন্তা সুরু হয় নতুন করে। হৃদয় বৃত্তির সঙ্গে মেধার যোগ ঘটে।

সমাজজীবনের নিরর্থ গ্লানি, মামুলী গোষ্ঠীসুখের প্রাণহীনতা, সম্ভোগের ক্লান্ত অতৃপ্তি, কবিতার প্রতি নিষ্ঠা—এই সব মিলিয়ে এক দুরন্ত পৌরুষের সন্ধান চলে এই পাঠের কবিতাগুলিতে। পুরুষের ভাগ্য, সমাজের অত্যাচার, বোধের বিড়ম্বনা, বহমান সময়ের কটাহে ব্যক্তির জরায়ণ—এসব বুদ্ধিপ্রসূত চিন্তায় শরৎকুমার নিরত। জীবিকা পোষ মানাচ্ছে সব কিছুকে। তবু

দশটা ময়নার মধ্যে একটা তিতির থেকে যায়। এক মৌল বিপত্তির কবিকীর্তিত কুশাঙ্কুর কাঁটার মতো বেঁধে কবিকে। তবু একেকবার হরতনের শিবির আঁকড়ে শেষ জুয়ায় বাজি ধরে দেখতে ইচ্ছে করে জিততে কেমন লাগে।

এরপর দেখতে দেখতে বছর পাঁচেকের মধ্যে আমরা শরৎকুমারকে দেখি স্থিত বুদ্ধির অনুগত। 'নকশা' অভিধায় প্রকাশিত কবিতাগুলিতে এক তীরন্দাজ মিতভাষী অব্যর্থ সন্ধানীর দেখা মেলে।

'বড়ো বেশি হট্টগোল, অর্থাৎ বড়ো বেশি ভাবালুতা ও কৃত্রিমতা—এখনকার কবিতা সম্পর্কে ক্রমশ এই ধরনের অস্বস্তি আমায় ভাবিয়ে তুলেছে। নিজে আমি এই একঘেয়েমি থেকে নিষ্কৃতি পেতে চেষ্টা করলাম। খুব সহজভাবে এবং সোজাসুজি আমার বার্তা পাঠককে পৌঁছে দিতে পারি, এই ভেবে নক্‌শা সিরিজে একগুচ্ছ কবিতা লিখেছি।' (ভূমিকা। মৌরীর বাগান ও কিছু নতুন কবিতা, ১৯৭২)

এখানে ক্ষুব্ধ সমাজ পরিবেশের প্রান্তে দাঁড়িয়ে কবি কিছু মননভিত্তিক মন্তব্যে রত, মিত ও সুস্মিত। পক্ষাবলম্বন নয়, হাত দিয়ে শুধু ব্যাথার জায়গাটিকে ছুঁয়ে দেওয়া, কিংবা মেনে নেওয়া মূল্যবোধের শিকড় ধরে একটু টান।

'হঠাৎ দরোজা খুলে গেল
নেতা ডাকলেন, কমরেড।' কিংবা
'দশবিশ বছরের পুরোনো খবর কাগজ ওলটালে
এইরকম রাশি রাশি জুতো দেখতে পাই আমরা।' কিংবা
'ঠোঁট আছে কিন্তু ঠোকর নেই
ডানা আছে কিন্তু উড়াল ভুলে গেছি।' কিংবা
'বিশ্বাস ভেঙেছিল অনেকদিন আগেই
এখন মূর্তি ভাঙার সময়।'

কীর্তিত ব্যবস্থার নৈরাজ্য ও অপদার্থতা, বণিক সভ্যতার অবিমৃষ্য কারিতা, ভোগ্যপণ্যের নৈর্ব্যক্তিক দুনো বাজার (একটা কালো তিরিক্ষি মেশিন কেমন প্রসব করছে অনায়াস সহজ), কাঞ্চনের অকিঞ্চনতা, কীর্তিস্তম্ভের শূন্যোদর ব্যর্থতা—এই সব সামাজিক বক্তব্যের পাশাপাশি কবি প্রেমিক দস্যু রূপান্ধ এখানে স্তিমিত।

'গাছ ভেবে
আমার ছায়ায় এসে বসলো
শিশুর হাত ধরে এক ক্লান্ত যুবতী।'

এখানে এবং পরবর্তী 'অন্ধকার লেবুবনে' আমরা শরৎকুমারকে অনেক ঘাতসহ সমাজ ব্যবস্থার নিপুণ একজন ডাঁটো মানুষ হিশেবে দেখতে পাই। কিন্তু একটু সতর্ক বিচারে চিনতে পারি এই নিপুণতা আত্মবিক্রয়ের ফল নয়, নিজেকে তুচ্ছতর স্ফীতোদর ঘাত প্রতিঘাতের বাইরে রাখার ক্ষমতা অর্জন করেছেন বলে। আস্তে আস্তে এক সফল তবু সচেতন, স্বপ্ন বিলাসী অথচ সাবধানী, বিরক্ত তবু অনুসন্ধিৎসু প্রৌঢ়ের চেহারা ফুটে ওঠে। বহিরঙ্গে তাঁর সব ঠিকঠাক, কিন্তু অন্তরে গোপন অতৃপ্তি, শিল্পের জন্য মায়া, সাফল্যের বিড়ম্বনা, অপ্রেম, অমল স্বপ্ন সবই লুকিয়ে আছে। আলোকিত মঞ্চ থেকে অন্ধকার লেবুবনে লাফিয়ে চলে যেতে চায় সে। সেখানে যৌবন বেদনার অম্লান কুসুম হয়ে খুকী ফুটে আছে, সার্থকতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে দেহে মনে। এই নিগূঢ় আর্তি, এই চিরবিচ্ছেদ—এটাই কবিতার প্রাণ। আর্তি থেকে সার্থকতর বার্তায় উদ্বর্তনে প্রকাশের ভঙ্গি হয়তো পালটেছে। কিন্তু একই রসবস্তু ঘনীভূত হয়েছে মাত্র সময়ের অভিজ্ঞতার আঁচে। কোন এক বিশুদ্ধ দার্ঢ্যের স্পর্শে রিরংসা বাৎসল্যে উদ্ভাসিত হয়, আপাত বিরক্ত গৃহকোণ শিশু ও প্রসূতির তৃপ্তিতে ভরে ওঠে, বৃত্তি ও সময়ের সমস্ত নিষ্ঠুর হরণ তুচ্ছ করে এক উদার বৈরাগী হৃদয় সামনের দিকে এগিয়ে চলে, মেধা ও প্রমিতির হাত ধরে।

আপাতসারল্যের অন্তরালে বক্তব্যের যে ঋজুতা ও অকৈতব নিষ্ঠা শরৎকুমারের উৎকর্ষ, পাঠককেও তার জন্য সৎ ও মনস্ক হতে হয়।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি কবিতা

ছোট্ট লাল তিল

মেয়েটিকে দেখো।

ওর বাঁ দিকের স্তনে একটি লাল তিল
সম্প্রতি উঠেছে। ছোট। ব্যথা।
ব্যথা, ওর সঙ্গী, ওকে ডোরাকাটা খরমুজের গন্ধের মতন
বেঁধে রাখে।
তবু লাল তিলের গোপন
খুঁত, গোপনীয়তার ষড়যন্ত্র আরো কষ্টকর।

মেয়েটিকে দেখো ওর ছোট্ট লাল নিজস্ব আলোয়।

এই শীতে ছাতিম ফুলের গুচ্ছে মোম,
কুয়াশায় মোম।
তিন ভাঁজ হয়ে পাতা দেহের সীমায় ওর
গুল্ফ দুটি অধিক নরম।
ব্যথিত রক্তিম, কিন্তু ওকে
ছুঁয়ো না নিশ্বাসে, চোখে,
ছুঁয়ো না আঙুলে।
একটি রোম যদি সরে যায়,
গর্ভের নিকটে ফোটা কুন্দগুলি যদি ঝরে যায়!
ওকে দেখো।

যেভাবে মানুষ

দু'হাতে ধূপের বাক্স
চামেলি চন্দন কিংবা গম্ভীর অগুরু।
একটা কাঁধ হেলে গেছে সুগন্ধের ভারে
ক্লান্ত মুখ প্রোটিনবিহীন;

মৃদুকণ্ঠে যুবকের ক্ষুদ্র অনুরোধ:
এক বাক্স নিন।

প্রথম আক্ষেপ:
ধূপ কেন? ধূপ কা'কে? আমার দেবতা কেউ নেই।
পিতৃপিতামহ খুব সাধারণ মানুষ ছিলেন,
পূজনীয় কিছু কি দেখেছি?
তদুপরি
দেশনেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা কিছু কম।
ধূপ নিয়ে বলো তো, কী করি?
দ্বিতীয় আক্ষেপ:
ম্রিয়মান যুবা, তুমি সুগন্ধ বাতাসে দাও?
আর অন্য পণ্য কি পেলে না?

পছন্দ হোল না কথা—
বুঝি আত্মাভিমানে লেগেছে, কিন্তু আমি নিরুপায়।
চেয়ে দেখি, আরো একটা মেরুদণ্ড
দৌড়ে চলে গেল দূরে, যেভাবে মানুষ
যুদ্ধে চলে যায়।

ফাঁদ

তুমি ফাঁদ পেতে রেখেছিলে
তাই ওরা ফিরে গেল,
পরী দুটি বারান্দা পর্যন্ত এসে তবুও নামলো না
ভোরবেলা
এ-ওর মুখের দিকে একটু চেয়ে কী এক ছুতোয়
উড়ে গেল। উড়ে যেতে-যেতে বলে গেল:
তুমি ফাঁদ পেতে রেখেছিলে, কেন হাত
করঙ্ক বিধৃত হাত পাতো নি বলো তো?

ওকি,
হাতে এত ক্ষতচিহ্ন কেন ?
কেন করেখাগুলি সব দুমড়ে গেছে ?
আঙুল গোনার
ঘাটগুলি কই ?
নাকি কুটো ভেবে কোনো বিপর্যস্ত পাখি
ঠোঁটে ক'রে নিয়ে গেছে ? অন্ধ ভুলে তাই
পেতেছ মিথ্যার ফাঁদ ! কিন্তু সেই পাখি
সে-ও তো ফিরবে না।

কাঁঠাল

আমি নিষেধ করি।
বলি, বড়ো হও,
বলি, পেকে ওঠো আগে সম্পন্ন কাঁঠালের মতো,
হৃদয়কে প্রস্তুত করো শূন্যতার জন্যে,
শিক্ষিত হও ছিন্নভিন্ন হওয়ার উত্তেজনায়।
ওরা কথা শোনে না।
আমার ঘুমের মধ্যে বারবার
ফিরে আসে কচি মেয়েলি হাত ; দেখতে পাই
অনেকগুলো সরল নখ যৌথভাবে
বিঁধে যাচ্ছে ক্রমশ বিঁধে যাচ্ছে···

ব্যবধান

পথচলার রাস্তা জুড়ে তিনটি যুবক
কথা বলে
কী-কথা ওরাই জানে। কী অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজনে
জুড়ে থাকে পথ !
সমাজের মানুষ হিশেবে
কিছুতে বুঝি না।
বুঝি না ওদের বাংলা—

ওরা অন্যভাবে কি শিক্ষিত ?
ইচ্ছে করে, বলি, একটু তফাতে দাঁড়াও
নয়তো বাড়ি যাও।
বলি না, কারণ ভয়, ওরা যদি অসম্মান করে !
চিন্তাটা নতুন !

এইভাবে বাড়ে ব্যবধান, আমি বুঝি
পরবর্তীকালের মানুষ
অনাত্মীয় হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ আমারই অনাদরে।
আজ ওরা তিনজন, কাল কিংবা কিছুকাল পরে
তিনশো জন—ওরাই জনতা, পথরোধ,
আর আমি অপস্রিয়মাণ।

তারপরে

এতটুকু পারি, এর বেশি তো পারি না।
পথ ভরে রয়েছে ভিখারী,
ওরা যে আমারও কাছে ভিক্ষে চায় !
আমি দিই সামান্য দক্ষিণা।

আমরা পুষি টিয়াপাখি, খরগোশ, মানুষ,
মানুষের অপমান,
আমরা অশ্বমেধ নয়, নরমেধ নয়,
নিত্য আত্মমেধ যজ্ঞ করি,
তারপরে অবভৃথস্নান।

জামা

সবচেয়ে পুরোনো কিন্তু সবচেয়ে প্রিয়
আমার শাদা জামাটি—
তার নাম দিয়েছি আশ্বিন।
সবচেয়ে পুরোনো এবং সবচেয়ে প্রিয় মেয়েটি

উপহার দিয়েছিল একসময়।
একটুতেই ভিজে ওঠে,
তার ত্বকে শাদা মেঘের নরম।

মন খারাপ হলে আলনা থেকে নামিয়ে আনি
হলুদ কলার-দেয়া গেঞ্জিটা :
খুশী।
সে আমায় দু পাশ থেকে ঘিরে
বুকের মধ্যে চেপে ধরে,
বাহুর ওপর ছড়িয়ে দেয় বন্ধুত্ব।
আড়চোখে একবার চেয়ে যে-মেয়েটি
হনহন ক'রে হেঁটে চলে গেল,
তাকে বলতে পারি : না এলে!

পারতাম না, যদি আমার গায়ে থাকতো অশোক—
কমলারঙের দানাদার ;
বড়ো হয়রান করেছে ওই রংটা আমার যৌবনে।
আমার রক্তের ছিটেফোঁটা
লেগেছিল এক সময়, মুছে গেছে এখন,
শুধু গরমটা যায় নি।

আমার ভ্রমণের সঙ্গী এরা কেউ নয়।
তাকেই তুলে নিই, যে আমায়
একলা করে দিতে পারে এক মুহূর্তে—
সেই রংচটা মৃদু গেরুয়া পানজাবি,
নাম দিবাকর।
রোদ লাগলে সে উড়তে থাকে পতাকার মতো,
বাতাস লাগলে ফুলে ওঠে,
আমাকে সুদ্ধ তুলে নিয়ে যায়
দৃশ্য থেকে অদৃশ্য—না কী যেন—কারিতায়।

চারকোণা ফ্রেমে রচিত নির্জনতা

আধবোজা চোখ উদাসীন ঢুলুঢুলু
বিড়াল বসেছে ছককাটা কম্বলে
এক পা মুখের নিকটে ঈষৎ তোলা
থাবাটি চাটছে আইসক্রীমের মতো।

তিনপাশে তার ঘিরেছে কুটির শ্রেণী
নিজ কাজে রত লোকেরা ইতস্তত
পিছনে অস্তমিত সূর্যের ছায়া
দৃশ্যটি আঁকা হালকা বাদামী রঙে।

আসলে, বিড়াল শিষ্ট বা নিস্পৃহ
নয় তিলার্ধ, কে না জানে সেই কথা?
পরস্পরের প্রশ্রয়ে এক গৃহ—
চারকোনা ফ্রেমে রচিত নির্জনতা।

আকচ ভুলেছে চরিত্রহীন পশু
বসেছে শান্ত শিল্পিত কম্বলে॥

পুরাতনী

রামকৃষ্ণ পরমহংস ও শশধর তর্কচূড়ামণি

সারথি, প্রথম বর্ষ, নবম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩২৭

পূজ্যপাদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়কে এই পত্রখানি লিখিয়াছিলাম—"রামকৃষ্ণ পরমহংসের সহিত আপনার পরিচয় ও আলাপাদির বিবরণ সংক্ষেপে আপনার মুখে বহু পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম। শ্রীম-কথিত রামকৃষ্ণ কথামৃত পড়িয়া দেখিতেছি, আপনার কথিত বিবরণের সহিত রামকৃষ্ণ কথামৃতে বিবৃত ঘটনার প্রায়ই মিল নাই। সুতরাং এ বিষয়ের প্রকৃত বিবরণ আমূল জানিতে বিশেষ কৌতূহল হইতেছে। পরন্তু, রামকৃষ্ণের ভক্তগণ তাঁহাকে অবতার স্বরূপ মনে করেন এবং সাধারণে তাঁহাকে 'পরমহংস' বলিয়াই জানেন। রামকৃষ্ণ সত্য সত্যই অবতার পদবী লাভ করিয়াছিলেন কি না, সাধনার পথে তিনি কিরূপ অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং প্রকৃতই তাঁহার পারমহংস্য লাভ হইয়াছিল কি না—জানিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। আপনি শাস্ত্রের যথার্থ মর্ম্মজ্ঞ পণ্ডিত এবং রামকৃষ্ণের সমসাময়িক ও পরিচিত; তাই আশা হইতেছে, মহাশয়ের দ্বারা আমাদের এ সংশয় নিরাকৃত হইবে।" —শ্রীপঞ্চ শিখ।

চূড়ামণির পত্র

রামকৃষ্ণ, 'পরমহংস' উপাধি কাহার নিকট পাইয়াছিলেন, তাহা আমি জানি না। খুব সম্ভব উহা সাধারণ লোকের নিকটই পাইয়াছিলেন। আজকাল সাধারণ লোকেরাই ঋষি, মহর্ষি, অমুকানন্দ, অমুকস্বামী, অমুক পরমহংস ইত্যাদি উপাধি নিয়া ও দিয়া থাকেন। ইহার দৃষ্টান্ত কলিকাতা অঞ্চলে যথেষ্ট আছে। রামকৃষ্ণের পরমহংস নামও বোধহয় সেইভাবেই হইয়াছিল। আর যদি তাঁহার গুরুই ঐ উপাধি দিয়া থাকেন; তবে তাহাও তাঁহার ভ্রান্তিমূলকই বুঝিতে হইবে। কারণ, শাস্ত্রে যেরূপ অবস্থা হইলে

পরমহংস বলা যায়, সে লক্ষণ তাঁহাতে আমি দেখিতে পাই নাই। এ কারণে তাঁহার প্রতি ঐ উপাধিটি ব্যবহার করিতে আমি সাহস পাই না। তবে তাঁহাকে আমি মহাশয় লোক বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, এই জন্য আমি তাহাই বলিয়া থাকি। আর, আশ্রমের ভাবে ধরিলে তাঁহাকে কোন সংজ্ঞাই অকুণ্ঠিতভাবে দেওয়া যায় না। তাঁহার পরমহংসের লক্ষণ যেমন ছিল না, তেমন তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমত্রয়েরও শাস্ত্রতঃ লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই। তিনি দণ্ডীও ছিলেন না। তবে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের ব্যবস্থামতে তাঁহাকে অবধূত আশ্রমী বলিলে, নিতান্ত অসঙ্গতও হয় না। অতএব আমার বিবেচনায় তাঁহাকে রামকৃষ্ণ অবধূত বলাই উচিত।

রামকৃষ্ণের সহিত আমার অনেক দিনই দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে। প্রথম তিনিই আমার কলিকাতার বাসায় গিয়াছিলেন। তৎপরে আমিও তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম। শেষে তিনিও মধ্যে মধ্যে আমার নিকট আসিতেন, আমিও মধ্যে মধ্যে তাঁহার নিকট যাইতাম। "ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে তোমার কোন চাপ্‌রাস্ আছে কি নাই"— আমাকে এতটুকু জিজ্ঞাসা করার অধিকার আমি তাঁহাকে দেই নাই; সুতরাং তিনি ঐভাবে আমাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেনও না এবং করেনও নাই। তিনি যে লেখাপড়া কিছু জানিতেন না এবং শাস্ত্রও পড়েন নাই, এ বিষয়ে তিনি বেশ ধারণা রাখিতেন এবং আমি যে তখন ২৫/৩০ বৎসর পর্য্যন্ত যথাশক্তি শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছি, তাহাও তিনি জানিতেন। আমাকে তিনি নিতান্ত অপাত্র বা তাঁহার অনুচরগণের একতম বলিয়াও মনে করিতেন না। কাজেই আমাকে ঐরূপ প্রশ্ন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে।

আমি কোন ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা বা উপদেশ লওয়ার নিমিত্ত তাঁহার নিকট যাই নাই। কারণ, তিনি কোন প্রকার শাস্ত্রই জানিতেন না। সুতরাং অধ্যাত্ম বিষয়, ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয় বা ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয় বা তৎপ্রাপ্তি-সাধনাদি বিষয়ে কোন কিছুই তাঁহার বিদিত ছিল না। তাঁহার যাহা বিদিত ছিল, তাহা সাধারণ জ্ঞানের বিষয়। শাস্ত্র বিষয়ে যাহারা একেবারেই অজ্ঞ, তাহাদের পক্ষেই তাহা উপযোগী / ৫৪৬ / হইতে পারে ও হইত। রামকৃষ্ণকথামৃত দেখিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। তবে তিনি শাস্ত্রাদি না জানিলেও কেবল গুরুর উপদেশ অনুসারে নিজের অনুষ্ঠান করিয়া অনেকটা উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন এবং সাংসারিক বন্ধনও কতকটা কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন,

ইহা আমি বিশ্বাস করি এবং ভক্তিরাজ্যেও তিনি অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিলেন, ইহা আমি স্বীকার করি ; কিন্তু সে অনুষ্ঠান বা ততটুকু ভক্তিশিক্ষা অনেকের আবশ্যক বা উপযোগী হইলেও সকলের নহে।

তাঁহার ভক্তিমাখা গান শুনিতে বড় ভাল লাগিত, ভক্তির ভাব দেখিতেও আনন্দ হইত।

তদ্ব্যতীত তিনি কতটা উন্নত হইতে পারিয়াছেন, তাহা বুঝিবার জন্য বিশেষ কুতূহল ছিল। আর তিনি অকপট সাধু প্রকৃতির লোক বলিয়া ধারণা ছিল। এই সকল কারণে তাঁহার নিকট মধ্যে মধ্যে যাইতাম। তিনি সাধারণ লোকের নিকট হাসিতে হাসিতে যে সকল চৌট্‌কা কথা বলিতেন, তাহাও বেশ মিষ্ট লাগিত ; কিন্তু আমার নিকট তিনি কি কারণে সময় সময় আসিতেন, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তবে শাস্ত্রের ২/৪ টী কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, ইহা স্মরণ আছে। আমাকে তিনি বিশেষ একটু মমতার দৃষ্টিতে দেখিতেন, এরূপ আমার মনে হইত। আমি যে ধর্ম্মের ব্যাখ্যা কার্য্যে ব্রতী ছিলাম, তাহাতেও তিনি বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করিতেন। মমতার কারণ বোধহয় তাহাই হইবে। তিনি আমার কিছু বয়োজ্যেষ্ঠও ছিলেন।

তাঁহার উন্নতি কি পরিমাণ হইয়াছিল, তাহা স্থির করিয়া বলা কঠিন। তবে বাহিরে তাঁহার যে সকল লক্ষণ দেখা গিয়াছে, তাহাতে তিনি যে একজন সাধুপ্রকৃতির লোক এবং অধ্যাত্মরাজ্যেও এই স্থূল দেহের সম্বন্ধ কাটাইয়া আন্তররাজ্যের মনোময় কোষ অর্থাৎ প্রথম ভূমিকায় আরোহণ করিতে পারিতেন, ইহা বেশ বুঝিয়াছিলাম। তিনি সকলকেই প্রায় সস্নেহে হাস্যমুখে কথা বলিতেন। ভোগ্যবস্তু বিষয়েও তাঁহার আসক্তি অনেকটা কমিয়াছিল, ইহা আমার ধারণা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি এক শ্রেণীর অবধূত। সে অবস্থায় প্রসাদ — মৎস্য মাংসাদি ভোজন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে ; কিন্তু খাইতেন কিনা তাহা আমার স্মরণ নাই। তবে রীতিমত তৈলাভ্যঙ্গপূর্ব্বক স্নান এবং বারম্বার পান খাওয়া দেখিয়াছি। স্ত্রীলোকদিগকে তিনি মাতৃবৎ ব্যবহার করিতেন। তিনি দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতেই থাকিতেন, সেখানে মায়ের নানাবিধ উত্তম উত্তম ভোগ হইয়া থাকে, সেই প্রসাদ খাইতেন।

তৎপর তাঁহার গুণ-গরিমা সাধারণ্যে প্রকাশিত হইলে, অন্য লোকেও

উৎকৃষ্ট দ্রব্য লইয়া তাঁহাকে দিত ; বাড়ী আনিয়াও অনেকে খাওয়াইত ; সুতরাং আহার তাঁহার উৎকৃষ্টই ছিল। অতএব তাঁহার টাকাকড়ির কোন প্রয়োজন ছিল না, তাহা নিতেনও না। এ কারণে তাঁহাকে একটি উন্নত পুরুষ অবশ্যই বলিতে হইবে। তিনি স্বয়ং গান করিতে করিতে, কিম্বা অন্যের গান, অথবা ঈশ্বরবিষয়ক প্রসঙ্গ শুনিলে, কিছুকালের মত তাঁহার এক প্রকার সমাধির মত অবস্থা হইত, তখন বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। কিয়ৎকাল পর আবার জাগ্রত হইয়া উঠিতেন। এই সমাধি তাঁহার মনোরাজ্যে থাকিয়াই হইত, তাহার উপরে নহে। কারণ, তিনি ঈশ্বরের রূপ-গুণেই মগ্ন থাকিতেন, তাহার উপরে নহে। রূপানুভূতি মনোরাজ্যেই হইয়া থাকে, ইহা অধ্যাত্মবিদ্যার স্থিরীকৃত সিদ্ধান্ত। তাহার পর যে অধ্যাত্মরাজ্যের অসংখ্য প্রকার স্তর আছে, সমাধিরও অসংখ্য অবস্থা আছে, আর সর্ব্বোপরি যে নিত্যশুদ্ধ মুক্ত স্বভাববস্তু যেখানে গিয়া নির্বীজ বা নির্ব্বিকল্প সমাধি হইতে পারে, সে সকল বিবরণ তিনি জানিতেনও না, সে সকল সমাধি হওয়ার সম্ভাবনাও তাঁহার ছিল না। সে সকল তত্ত্ব যাহাতে আছে, সেই অধ্যাত্মশাস্ত্র বা ব্রহ্মবিদ্যার গ্রন্থ তাঁহার একেবারেই অবিদিত ছিল। তিনি লেখাপড়া আদৌ জানিতেন না ; সে সকল তত্ত্ব এত দুরূহ যে, রীতিমত দর্শন এবং উপনিষদ্ অধ্যয়ন ব্যতীত, কেবল গুরুর উপদেশে তাঁহার ধারণা বা জ্ঞান বা তাহাতে কোন অনুষ্ঠান কদাপি হইতে পারে না। কাজেই তিনি স্থূলদেহ ছাড়িয়া উঠিতে পারিলেও মনোময় কোষ অতিক্রম করিতে পারেন নাই, ইহা বুঝিয়াছিলাম।

তাঁহার [যে] সমাধির ভাব হইতে দেখিয়াছি, তাহা সমাধির নিয়মানুসারে হয় নাই। গানাদি শ্রবণ মাত্রে অমনি তৎক্ষণাৎ হইয়া গিয়াছে, আবার কিছুকাল পরে হঠাৎই তাহা ভঙ্গ হইত। এতদ্বারা এই সমাধিকে ঠিক /৫৪৭/ অনুষ্ঠানের ফলও বলা যায় না। ইহা মস্তিষ্কের অবস্থাবিশেষের ফল হওয়াই অধিকতর সম্ভব। যাহাদের মস্তিষ্কের অংশবিশেষ দুর্ব্বল থাকে তাহাদের কোন কোন বিষয়ের সামান্য ঘটনাও মস্তিষ্কে গুরুতররূপে জানায়। তখন অবস্থা বিশেষে কাহারও কাহারও বাহ্য সংজ্ঞার লোপ হইয়াও থাকে। শোক, তাপাদির দ্বারা অনেকস্থলে এরূপ ঘটনা হইয়া থাকে, গানাদি শ্রবণেও ইহা দেখা গিয়াছে। হাওড়ার নিকট শিবপুরে এক ব্রাহ্মণের একটি ছেলে দেখিয়াছিলাম। তাহার ৫/৬ বৎসর বয়স হইতেই খোল করতালসহ

কীর্ত্তনাদি গান হইলে, অনেকক্ষণ বাহ্য সংজ্ঞার অভাব হইত। ২০/২৫ [পল] বা অর্দ্ধদণ্ড পর, আবার সে প্রকৃতিস্থ হইত। পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমে তাহা কমিতে লাগিল, ১৬ বৎসরের পর একেবারেই সারিয়া গেল, তখন সে অতি কুপাত্র হইয়াছিল। ৫ বৎসরের সময় ইহার এরূপ অবস্থা দেখিয়া নব্য অবতারবাদীরা ইহাকে গৌরাঙ্গের অবতার বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। অজ্ঞের মহিমা অপার! আমার একজন শিষ্য দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়েরও এরূপ অবস্থা হইত। এখন তাহা সারিয়া গিয়াছে। এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও যথেষ্ট আছে। রামকৃষ্ণ মহাশয়ের মস্তিষ্কীয় অবস্থাও অত্যন্ত অনুভবশীল ছিল। কোন কুলোক বা সুলোক তাঁহাকে স্পর্শ করিলে, কিম্বা কোন পান ভোজন করিতে দিলে, তদ্দ্বারা তাহাদের শক্তি যেটুকু সংক্রান্ত হইত, তাহাও তাঁহার অনুভবে আসিত। স্বর্ণাদি ধাতুবস্তু স্পর্শেও তিনি বিশেষত্ব অনুভব করিতেন। তাঁহার প্রকৃতি অত্যন্ত কোমল থাকার অন্যান্য প্রমাণও যথেষ্ট আছে। সেই কারণেই গান করা বা শুনাকালে তাঁহার ঐরূপ বাহ্যসংজ্ঞার বিলোপ হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা। অজ্ঞান অবস্থায় যে তিনি হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিতেন, সেই বিক্ষেপ ইহারই ফল বলিয়া মনে হয়। সমাধি শাস্ত্রে এরূপ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

যদি এই সিদ্ধান্ত সত্য হয়, তবে ঐরূপ অবস্থায় যে তাঁহার মনোময় কোষে সমাধি হওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা অমূলক। তবে তিনি বিজনে বসিয়া কতদূর কি করিতে পারিতেন, তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু দেহের সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া তিনি ইচ্ছা করিলেই মনোময় কোষে যাইতে পারিতেন, ইহা বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। তিনি দেহত্যাগ করার পূর্ব্বে, মাস ৫/৬ পর্য্যন্ত গলরোগের দারুণ যন্ত্রণায় কাতর হইয়াছিলেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক মনোময় কোষে উঠিতে পারিলে, তাঁহাকে এ যন্ত্রণা মোটেই ভোগ করিতে হইত না। এই সময় আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ [হইয়া] ছিল। তখন এই যন্ত্রণা নিবৃত্তির জন্য এই জাতীয় একটা অনুষ্ঠান করার পরামর্শ দিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন যে, "আমি একাগ্রতার চেষ্টা করিলে, ইষ্টদেবতার দিকেই লক্ষ্য পড়ে; সুতরাং আমি ইহা করিতে পারিব না।" তাহা হইলেও তিনি, যোগজ শক্তিবলে মনোময় কোষাদিতে উঠিতে পারুন, আর নাই পারুন, তিনি যে একটি সাধু প্রকৃতিসম্পন্ন মহাশয় লোক ছিলেন, এরূপ সিদ্ধান্তের কোনই বাধা নাই। কিন্তু দেহাবসানের

কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি কিছু নীচে নামিয়া পড়িয়াছিলেন, ইহা বেশ অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম।

আমি এইটুকু [বুঝিতে পারিয়া] একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, আমি আত্মীয়ভাবে আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি, তাহা আপনার প্রীতিকর হইবে কিনা ইহা ভাবিতেছি। তখন তিনি বলিলেন, "আপনি অবশ্যই তাহা বলিবেন।" আমি বলিলাম, "আপনার সহিত আমার পরিচয় হইলে প্রথমভাগে আপনার অবস্থা যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছিলাম, এখন যেন তাহার একটু নিম্নদিকে পরিবর্ত্তন মনে হইতেছে। ইহা সত্য কিনা, তাহাই জানিতে বাসনা। নিজের অবস্থা আপনি নিশ্চয় বুঝিতে পারিবেন।" তখন তিনি একটু বিষাদের সহিত বলিলেন, "আপনি তো ঠিক ধরিয়াছেন! আপনি ইহা কেমন করিয়া বুঝিলেন? আমি তো সর্ব্বদাই আমার অবস্থান্তর অনুভব করিতেছি। ইহার কারণ আপনার কি মনে হয় বলুন দেখি?" আমি বলিলাম, "অন্য কারণ কিছু থাকিলে আমার অবিদিত, আপনি কুসংসর্গের আবর্ত্তে পতিত হইয়া আছেন, ইহাই আমি প্রধান কারণ মনে করি।" তিনি বলিলেন "ইহাও তো আপনি ঠিক্ বুঝিয়াছেন। আমি ইহা বেশ অনুভব করি এবং এ সংসর্গ-ত্যাগেরও চেষ্টা সর্ব্বদাই করি; কিন্তু (গালাগালি দিয়া * * *) উহারা যে আমাকে ছাড়ে না, এখন আমি উহাদের খপ্পরের মধ্যে পড়িয়াছি। এখন এ বন্ধন কাটানোর আর উপায় নাই। কাজেই এবার /৫৪৮/ এইভাবেই যাইবে।" ইহার কিছুদিন পরেই গলরোগ, তৎপরে দেহাবসান হয়।

তাঁহার যোগজ কোন বিভূতি আমি দেখি নাই। তবে বক্ষাদিতে হস্তামর্ষণের দ্বারা কাহারও কাহারও বেদনাদি অল্পকালের জন্য তিরোহিত হইতে দেখিয়াছি। ইহা যৌগিক শক্তির কার্য্য নহে, নৈয়াসিক শক্তির কার্য্য; ইহা বৃহদারণ্যকেও বর্ণিত আছে।

ইঁহার উপদেশের দ্বারা কলিকাতা অঞ্চলের অনেক লোক উপকৃত হইয়াছিলেন। যাঁহারা পুরাতন পথেই অবস্থিত, তাঁহাদের পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং ধর্ম্মকর্ম্মের আস্থা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এমন কি, যাঁহারা সনাতন পথভ্রষ্ট, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বস্থানে আসিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। তখন শুনিয়াছিলাম, ৺কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়, ৺বিজয় গোস্বামী প্রভৃতির নববিকৃত মতের পরিবর্ত্তন ইঁহার দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছিল।

এ উপকার হিন্দু সমাজের চিরস্মরণীয়। রামকৃষ্ণ [মহাশয়ের] সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইমাত্র যথাজ্ঞান বিবৃত করিলাম। / ৫৪৯ /

রচনা পরিচয়

'রামকৃষ্ণ পরমহংস ও শশধর তর্কচূড়ামণি' রচনাটি অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত 'সারথি' পত্রিকায় ১৩২৭ সালের ফাল্গুন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। এখানে 'প্রথম' প্রকাশ কথাটি নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। 'সাহিত্য' পত্রিকায় ১৩২৭ সালের পৌষ-মাঘ মাসে (যুগ্ম সংখ্যা) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ, এম্-এ 'রামকৃষ্ণ পরমহংস ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শশধর তর্কচূড়ামণি' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন : এই প্রবন্ধের মধ্যে তর্কচূড়ামণির 'সমগ্র' চিঠির প্রতিলিপি ছিল। চিঠিটি [তারিখ ২৫শে পৌষ ১৩২৭] পদ্মনাথকে লেখা। সমসাময়িক বিবরণ থেকে মনে হয় পৌষ-মাঘের 'সাহিত্য' প্রকাশিত হওয়ার আগেই ফাল্গুনের 'সারথি' মুদ্রিত হয়[১]। তর্কচূড়ামণির 'সমগ্র' পত্র, পদ্মনাথের আলোচনা এবং তর্কচূড়ামণির আরও দুটি পত্রসহ পদ্মনাথের দ্বিতীয় প্রবন্ধ ('সাহিত্য', পৌষ ও মাঘ ১৩২৮) পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। আগ্রহী পাঠক মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ প্রণীত 'রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ' (বারাণসী, ১৯২৪) বইটি দেখতে পারেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস ও শশধর তর্কচূড়ামণি দুজনেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে খ্যাতকীর্তি, বিশিষ্ট ভক্তমণ্ডলী পরিবৃত এবং বহু আলোচিত পুরুষ। শ্রীরামকৃষ্ণের (১৮৩৬-১৮৮৬) জীবন ও বাণী সেকালে সর্বধর্মসম্প্রদায়ের মানুষকে আকর্ষণ করেছে, এবং ঐতিহাসিক বিচারে বাংলা দেশের ধর্মীয় আন্দোলনে তাঁর প্রভাব ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর ভক্তমণ্ডলী পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের একাধিক পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচিত হয়েছে, এবং তাঁর উপদেশাবলী পাঁচখণ্ডে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত' (১৯০২-১৯৩২) নামে প্রকাশিত হয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' (১৯৫২) গ্রন্থের ভূমিকায় জানিয়েছেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে অনেকে ধ্যান

ও কল্পনার সাহায্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাব ভক্তির আতিশয্য দিয়া পূরণ করিতে চাহিয়াছেন। এই সকল রচনার সাহায্যে তিনি আসল মানুষটি কেমন ছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। আমরা সেই আসল মানুষটিকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি,—কল্পনার দ্বারা নয়, ভক্তির দ্বারা নয়, সমসাময়িক সাক্ষ্য-প্রমাণের দ্বারা। আমাদের এই বইখানি ডকুমেন্টারি ইতিহাস।' শ্রীরামকৃষ্ণ 'আসল মানুষটি কেমন ছিলেন' জানবার আগ্রহ সেকালে এবং একালে অনেকের মনে দেখা দিয়েছে এবং 'ডকুমেন্টারি ইতিহাস' নিশ্চয়ই তা জানতে সাহায্য করবে। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত অনেক 'ডকুমেন্ট' ব্যবহার করেননি, সম্ভবত তাঁরা বিশেষ কোনো নীতির বশবর্তী হয়ে 'সমসাময়িক সাক্ষ্য প্রমাণে'র মধ্যে কিছু গ্রহণ করেছেন, কিছু বর্জন করেছেন। ফলে 'সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস' গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ — পুনর্মুদ্রিত বর্তমান রচনাটি সেই অসম্পূর্ণতা কিছুটা দূর করবে। শ্রীরামকৃষ্ণের সমসাময়িক আরও অনেকের স্মৃতিকথা বর্তমানে বিস্মৃতপ্রায়, সেগুলি পুনর্মুদ্রণের ঐতিহাসিক প্রয়োজন আছে। অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের সমসাময়িক কালকে জানতে হলেও এই রচনাগুলির প্রয়োজন আছে। শশধর তর্কচূড়ামণি সম্বন্ধে যাঁরা কৌতূহলী তাঁদের কাছে উদ্ধৃত রচনাটি ('চূড়ামণির পত্র') অমূল্য বিবেচিত হবে।

শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮৫০-১৯২৮) সম্বন্ধে একালে অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালী হয় কিছুই জানেন না, অথবা এমন কিছু জনশ্রুতির সঙ্গে পরিচিত যা আদৌ তথ্যসমর্থিত নয়। বঙ্কিমজীবনী এবং রবীন্দ্রজীবনীতে শশধরের উল্লেখ আছে, কিন্তু সেখানে শশধরের সত্য পরিচয় নেই। 'রবীন্দ্রজীবনী'কার লিখেছেন, 'বাংলার তরুণদের উপর চূড়ামণির ন্যায় পণ্ডিতের প্রভাব কিরূপে সম্ভব হইল, তাহা ভাবিবার বিষয়; যে-লোকের না ছিল পাণ্ডিত্য, না ছিল আধ্যাত্মিক বল, সে লোক কি জাদুবলে চন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীদের মন হরণ করিল।'[২] কিন্তু শশধরের কোনো লেখা তিনি পড়েছেন বলে মনে হয়না, কাজী আবদুল ওদুদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাহায্যে তিনি শশধরের মূল্যায়ন করেছেন। শশধরের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কিন্তু সেকালের পণ্ডিতগণের কোনো সংশয় ছিল না, এমনকি বঙ্কিমচন্দ্র, যিনি ধর্মব্যাখ্যায় শশধরের সঙ্গে

একমত ছিলেন না, তিনিও বলেছেন 'তর্কচূড়ামণি মহাশয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।'[৩] ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, চন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ সেকালের 'মনীষীদের' মন যিনি হরণ করেছিলেন, তাঁর পাণ্ডিত্য বা আধ্যাত্মিক বল ছিল না, একথা বলা সমীচীন নয়।

শশধর তর্কচূড়ামণির পূর্ণাঙ্গ জীবনী এখনও লেখা হয়নি — তাঁর রচনার সঙ্গেও অনেকের প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই। শশধর ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে ডিসেম্বর, [জন্ম-সাল সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে] ফরিদপুর জেলার মুখডোবা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হলধর বিদ্যামণি, মাতা বিশ্বেশ্বরী দেবী। পাশ্চাত্ত্য বৈদিক বংশের সন্তান শশধরের পূর্বপুরুষের আদি নিবাস ছিল ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ায়। হলধর প্রাণপুর গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন। শশধর প্রথমে বিশ্বেশ্বর তর্কপঞ্চাননের কাছে ব্যাকরণ এবং পরে দুর্গাপ্রসাদ তর্কালঙ্কারের কাছে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। উনিশ বছর বয়সে বিক্রমপুর জেলার নাগরবন্দী গ্রামের ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তার দুবছর পরে পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে সাময়িকভাবে অধ্যয়ন বন্ধ রেখে তাঁকে পরিবার পালনের দায়িত্ব নিতে হয়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কাশিমবাজারের জমিদার অন্নদাপ্রসাদ রায়ের সঙ্গে শশধরের পরিচয় হয়। তিনি শশধরের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে নিজের সভাপণ্ডিত নিযুক্ত করেন। কাশিমবাজারের জমিদারের গ্রন্থাগারে ও বহরমপুরে রামদাস সেনের গ্রন্থাগারে নিয়মিত অধ্যয়ন শুরু করেন, এবং নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করেন। পরে অন্নদাপ্রসাদ রায়ের সঙ্গে কাশী যান এবং সেখানে শ্রীমৎ দণ্ডী বিশ্বরূপ স্বামীর কাছে উপনিষদ ও বেদান্ত পাঠ করেন। কাশী থেকে শশধর মুঙ্গেরে আসেন, যেখানে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের (পরে কৃষ্ণানন্দ স্বামী নামে খ্যাত) সঙ্গে পরিচয় ঘটে। হিন্দুধর্মের সাময়িক দুরবস্থা দূরীকরণের জন্য উভয়ে মিলিতভাবে ধর্মপ্রচারে উদ্যোগী হন। তাঁদের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রথমে মুঙ্গেরে 'আর্যধর্ম প্রচারিণী সভা' প্রতিষ্ঠিত হয়; পরে বিভিন্ন অঞ্চলে তার শাখা এবং হরিসভা, ধর্ম সংরক্ষিণী সভা, সুনীতি সঞ্চারিণী সভা, বাল্যাশ্রম ইত্যাদি তাঁরা স্থাপন করেন।

মুঙ্গের থেকে কলিকাতা আসার পথে বর্ধমানে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শশধরের পরিচয় হয়। ইন্দ্রনাথ শশধরের পাণ্ডিত্যে ও বাগ্মিতায় মুগ্ধ

হয়ে তাঁকে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। কলিকাতায় ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে শশধরের আবির্ভাব হয়। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 'পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি বক্তৃতা দিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় আসিয়া বঙ্কিমবাবুর সাহায্য চান। তাঁহার নিকট সাহায্য চাহিবার কারণ এই যে, তখন তিনি নবজীবনে ও প্রচারে হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু স্বীকৃত হইলে তাঁহার বাটীতে ঐ উদ্দেশ্যে একটি অন্তরঙ্গ-সভা বসে; তাহাতে অনেক সাহিত্যিক ও স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ভদ্রলোক উপস্থিত হন। Albert Hall বক্তৃতার স্থান স্থির হইল[৪]; বক্তৃতার একটা দিনও স্থির হইল। প্রথম দিবসে বঙ্কিমচন্দ্র কেবল যে শ্রোতা ছিলেন, এমত নহে, তিনি সভাপতিত্বে বৃত হইয়া চূড়ামণি মহাশয়কে শ্রোতাদিগের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। তারপর দুই একদিন মাত্র উপস্থিত হইয়াছিলেন, আর যান নাই। তাঁহার বিবেচনায় চূড়ামণি মহাশয়ের ব্যাখ্যাত ধর্ম্ম এক্ষণে এই দেশের উপযোগী নহে।'[৫] চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'তর্কচূড়ামণি মহাশয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, তিনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, নানা সূত্রে প্রাপ্ত নূতন শিক্ষার ফলে, দেশ এখন উহা অপেক্ষা উচ্চ ধর্ম্ম চায়।'[৬] রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরোধে আলবার্ট হল্-এ শশধরের বক্তৃতা শুনতে একদিন গিয়েছিলেন। 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'কিন্তু বঙ্কিমবাবু যে ইহার সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ দিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে। তাঁহার 'প্রচার' পত্রে তিনি যে-ধর্ম ব্যাখ্যা করিতেছিলেন তাহার উপর তর্কচূড়ামণির ছায়া পড়ে নাই, কারণ তাহা একেবারেই অসম্ভব ছিল।'[৭] বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টই লিখলেন, 'পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয় যে-হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে নিযুক্ত, তাহা আমাদের মতে কখনই টিকিবে না, এবং তাঁহার যত্ন সফল হইবে না।'[৮] বঙ্কিমচন্দ্রের সমর্থন হারালেও শশধর বঙ্কিম-শিষ্য অনেককে তাঁর অনুগামীরূপে পেলেন, এবং ধীরে ধীরে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের উপর তাঁর প্রভাব ব্যাপক প্রসার লাভ করলো। সময় অনুকূল ছিল — উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে নানা কারণেই হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন ঘটে, এবং সেই আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দেন, তাঁদের মধ্যে শশধর অন্যতম।

শশধরের শেষ জীবন কাটে বহরমপুরে, সেখানে টোলের অধ্যক্ষ রূপে

শাস্ত্রালোচনা ও নিভৃতে ধর্মসাধনায় ব্যাপৃত থাকেন। তিনি যে অসংখ্য বক্তৃতা দিয়েছেন তা অধিকাংশই লিপিবদ্ধ হয়নি। তাঁর রচিত পুস্তক-পুস্তিকা বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য। তাঁর লেখা যে বইগুলির সন্ধান পাওয়া গেছে, সেগুলির নাম যথাক্রমে — ভবৌষধ, ধর্ম্মব্যাখ্যা, সাধনপ্রদীপ, ভক্তি-সুধালহরী, দুর্গোৎসবপঞ্চক, বেদ বিষয়ে ইংরাজী মতের প্রতিবাদ[৯]; শ্রাদ্ধান্নবিবেক [সংস্কৃত], চূড়ামণি দর্শন [অসম্পূর্ণ ও অপ্রকাশিত]। 'বেদব্যাস' (বৈশাখ ১২৯৩) পত্রিকা তাঁর উদ্যোগে প্রকাশিত হয় (সম্পাদক ছিলেন ভূধর চট্টোপাধ্যায়)। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই ফেব্রুয়ারী শশধর তর্কচূড়ামণির মৃত্যু হয়।

শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থে প্রথম, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম ভাগে শ্রীরামকৃষ্ণ-শশধর-সংবাদ বর্ণিত হয়েছে। শশধর প্রথম কলিকাতায় এসে উঠেছিলেন ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে প্রথম গিয়েছিলেন শশধরের সঙ্গে দেখা করতে — বুধবার, ২৫শে জুন ১৮৮৪। প্রথম সাক্ষাতের বিবরণ 'বেদব্যাস' পত্রিকায়[১০] যেভাবে দেওয়া হয়েছে, তার সঙ্গে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে'র বর্ণনা[১১] মেলে না। মনে রাখতে হবে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে 'বেদব্যাস' পত্রিকায় প্রত্যক্ষদর্শীর [ভূধর চট্টোপাধ্যায়] বিবরণ প্রকাশিত হয়। শ্রীম-ও প্রত্যক্ষদর্শী, কিন্তু দুটি বর্ণনার অনৈক্য, বহু পরবর্তীকালে [মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ ভট্টাচার্যের অনুরোধে] শশধরকে 'কথামৃতে'র প্রতিবাদ করতে বাধ্য করেছে। (রামচন্দ্র দত্তও প্রত্যক্ষদর্শী। তিনি 'চাপরাশে'র উল্লেখ করলেও তাঁর বিবরণের সঙ্গে আবার শ্রীম-র বিবরণ মেলে না।[১২]) 'কথামৃতে'র যে-কথাটি শশধর বিশেষভাবে প্রতিবাদ করেছেন, সেটি হলো, 'হেঁজিপেঁজি লোক লেক্‌চার দিলে কিছু কাজ হয় না। চাপরাশ থাকলে তবে লোকে মানবে। ঈশ্বরের আদেশ না থাকলে লোকশিক্ষা হয় না। যে লোকশিক্ষা দিবে, তার খুব শক্তি চাই।'[১৩] শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে পরে শুনি, 'শশধরকে বললাম গাছে না উঠতে এক কাঁদি—আরও কিছু সাধন-ভজন কর তারপর লোকশিক্ষা দাও।···কিন্তু শুধু পণ্ডিত নয় — একটু বিবেক বৈরাগ্য আছে।'[১৪]

শ্রীরামকৃষ্ণ-শশধর দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার দক্ষিণেশ্বরে — সোমবার, ৩০শে জুন ১৮৮৪। 'কথামৃত' তৃতীয় ভাগে দুজনের কথোপকথনের বিস্তারিত বিবরণ আছে।[১৫] তৃতীয় সাক্ষাৎকার বলরাম বসুর গৃহে—বৃহস্পতিবার, ৩রা

জুলাই ১৮৮৪। 'কথামৃত' চতুর্থ ভাগে তার বিবরণ পাই।[১৬] এরপর শশধরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যান্য সাক্ষাৎকারের লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। সম্ভবত শেষবার তাঁদের দেখা হয়—রবিবার, ১৬ই অগাস্ট ১৮৮৫; তখন শ্রীরামকৃষ্ণ অসুস্থ। 'কথামৃত' পঞ্চম ভাগে তার বিবরণ।[১৭]

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে শশধর তর্কচূড়ামণির স্মৃতিকথা ('চূড়ামণির পত্র') প্রথম প্রকাশের পর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নানা বাদ-প্রতিবাদ হয়েছিল। শশধর সেই সময়ে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য, বিদ্যাবিনোদকে দুটি পত্র লেখেন, তা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছি —

'লোকের তিরস্কার আর পুরস্কারের কথা আর কি লিখিব। সে যাহার যেমন ইচ্ছা হয় করুক, তাহা তাহার মুখ আর হৃদয়েই থাকিবে, তদ্দ্বারা আমার বা আপনার কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। মহাত্মা ৺রামকৃষ্ণ বিষয়ে আমার যেরূপ ধারণা, তাহাই বিদিত করিয়াছি। তাঁহার মহিমার লাঘব করিবার মানসে কিছুই লিখি নাই; সুতরাং আমার ধারণার মূলে কোন অংশে ভ্রম থাকিলেও আমি পাপী নহি।'[১৮]

'অবধূত রামকৃষ্ণের নির্ব্বিকল্পসমাধি হইত কি না, তাহার সমর্থন ও অসমর্থন এই উভয় পক্ষেরই প্রমাণ সুদৃঢ় নহে; তবে যতটা দেখা গিয়াছে, তদ্দ্বারা যাহা বিবেচনা হয়, তাহাই বলিয়াছি এবং এখনও তাহাই বলিতেছি। যদি আমার বুঝিতে ভ্রম হইয়া থাকে আর সত্য সত্যই তিনি নির্ব্বিকল্পসমাধি ও নির্ব্বীজ সমাধি লাভ করিয়া থাকেন, তবে তাহা পরমানন্দের বিষয়। তিনি শুক নারদাদির মত মুক্তপুরুষ হইলে বা তাঁহার অনন্ত যশঃকীর্ত্তি ও মহিমা প্রকাশ হইলে আমার পৈত্রিক বা নিজ সম্পত্তির কোন হানি হয় না, সুতরাং সে বিষয়ে আমার দুঃখিত হওয়া বা তাহার অপলাপের জন্য আমার চেষ্টার কোন কারণ নাই। সমাজে যত বড় লোক হয়, ততই সমাজ ও দেশের উন্নতি, ইহা আমি সম্যক বিদিত আছি। কিন্তু তাই বলিয়া নিজের জ্ঞান-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত নহি। ৺রামকৃষ্ণকে আমি কিরূপ জানিতাম, তাঁহার সহিত আমার কিরূপ কথাবার্ত্তা হইত—ইহাই আপনার জিজ্ঞাসিত বিষয়। সুতরাং আমি যাহা জানিতাম, তাহা বলিয়াছি। ইহাতে যদি তাঁহার অনুগত লোকেরা ক্রুদ্ধ হইয়া ভৎর্সনা করেন, তবে করুন, আমি সেই ভয়ে সত্যের অপলাপ করিতে পারিব না।'[১৯]

অলোক রায়

১ প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী, '৺রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তদীয় সম্প্রদায়' প্রবন্ধের পত্রিকান্তরে প্রকাশিত প্রতিবাদের প্রত্যুত্তর, "ব্রাহ্মণসমাজ", পৌষ ১৩৩০।

২ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, "রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক", প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৭০, পৃঃ ২০৮।

৩ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্কিম-স্মৃতি', "নারায়ণ", বৈশাখ ১৩২২, পৃঃ ৬৩২।

৪ জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার জানিয়েছেন, 'কলিকাতায় তদানীন্তন ষ্টার থিয়েটারে সম্ভবতঃ তাঁহার প্রথম বক্তৃতা হয়। তাহার পর এলবার্ট হলে এবং টাউন হলেও তিনি বহুবার বক্তৃতা করিয়াছিলেন।' "বংশ-পরিচয়", পঞ্চবিংশ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৫০, পৃঃ ১৯।

৫ পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মশিক্ষা', "বঙ্কিম-প্রসঙ্গ" (সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত), কলিকাতা, [১৯২১], পৃঃ ৯২-৯৩।

৬ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোদ্ধৃত রচনা, পৃঃ ৬৩২।

৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "জীবনস্মৃতি", কলিকাতা, ১৯৬২, পৃঃ ১৪০।

৮ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'হিন্দুধর্ম্ম', "প্রচার", শ্রাবণ ১২৯১, পৃঃ ১৫।

৯ 'যে সময়ে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ প্রচার করেন, সেই সময়ে তিনি বেদ সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য মতের সমর্থন করিয়া এক সন্দর্ভ লিখিয়াছিলেন। পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তিনি সপ্রমাণ করেন যে, বেদ প্রকৃতির অনন্ত গৌরব-স্তুতিত অসভ্যজাতির গান নহে, উহা অতি সুসভ্য জাতির গ্রন্থ।' — জ্ঞানেন্দ্রনাথ কুমার, পূর্বোদ্ধৃত রচনা, পৃঃ ১৯।

১০ "বেদব্যাস", ফেব্রুয়ারী ১৮৮৮। দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, "সমসাময়িক দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস", কলিকাতা, ১৩৭৫, পৃঃ ৭৯-৮০।

১১ শ্রীম [মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত], "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত", প্রথম ভাগ, কলিকাতা, ১৩৮১, পৃঃ ১৩৭-১৪৫।

১২ রামচন্দ্র দত্ত, "রামচন্দ্রের বক্তৃতাবলী", কলিকাতা, ১৯০৫, পৃঃ ৪৮৪।

১৩ "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত", প্রথম ভাগ, পৃঃ ১৪০।

১৪ তদেব, পৃঃ ১৪৫।

১৫ "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত", তৃতীয়ভাগ, কলিকাতা, ১৩৮১, পৃঃ ৭২-৯০।

১৬ "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত", চতুর্থভাগ, কলিকাতা, ১৩৮১, পৃঃ ১১০-১১৪।

১৭ "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত", পঞ্চম ভাগ, কলিকাতা, ১৩৮১, পৃঃ ১৫০-১৫১।

১৮ পদ্মনাথ ভট্টাচার্য, "রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ", বারাণসী, ১৮৪৬ শক [১৯২৪], পৃঃ ৮০।

১৯ তদেব, পৃঃ ৮৬।

শিল্পভাবনা

“একটা কিছু ক'রতে হবে তো ?”

সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

চলচ্চিত্রে ঋত্বিক ঘটকের অন্তিম উক্তি—“একটা কিছু ক'রতে হবে তো ?” শেষ ছবি ‘যুক্তি-তক্কো-গপ্পো’ নীলকণ্ঠরূপী ঋত্বিক গুলি খেয়ে মরার আগে মদন তাঁতীর কাহিনী স্মরণ ক'রে ঐ কথাগুলি বলেন। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘শিল্পী’ গল্পের মদন তাঁতীর চরিত্রটি নিশ্চয়ই অনেকের মনে আছে। সারা গাঁয়ের মানুষের সঙ্গে একযোগ হ'য়ে মদন তাঁতী ভুবন মহাজনের টাকা প্রত্যাখ্যান করে তাঁত বন্ধ করে রাখে। কিন্তু তাঁত না চালালে পাছে পায়ের গাঁটে বাত ধরে এই ভয়ে মদন তাঁতী একরাত শূন্য তাঁতটা কেবল চালিয়ে গেছল। “একটা কিছু করতে হবে তো ?”

মদন তাঁতীর গল্পের উল্লেখটি তাৎপর্যপূর্ণ। ঋত্বিকের নিজের জীবনের ও বক্তব্যের নানা অসঙ্গতি, মানসিক ও শারীরিক বহুবিধ বিপর্যয়, তাঁর ছবিতে অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পাশাপাশি বালসুলভ অমনোযোগিতার অস্বস্তিকর সহাবস্থান থাকা সত্ত্বেও, ঋত্বিক একটি বিষয়ে অটল ছিলেন। তাঁর চিন্তাশক্তির তাঁতযন্ত্রটি বরাবরই চালু ছিল। অকর্মণ্যতা বা আলস্য এসে কখনই তাঁর চৈতন্যের গাঁটে বাত ধরায় নি। চলচ্চিত্র জগতের ভুবন মহাজনের ফরমায়েশ অনুযায়ী তিনি ছবি করেননি। ব্যক্তিগত জীবনে কখনো কখনো সুবিধাবাদী নীতি অবলম্বন করতে বাধ্য হলেও ক্যামেরার পিছনে যখন দাঁড়িয়েছেন চটুল চাহিদার সঙ্গে আপোষ করেন নি কখনও।

তাই তাঁর ছবিগুলি নির্মাণের পিছনে প্রায় সবসময়ই কিছু না কিছু চিন্তা

প্রকাশের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এ প্রয়াসটা কেবলমাত্র ‘কনটেন্ট’ নির্বাচনে (১৯৪৭-এর বাংলা-ভাগ ও তৎপরবর্তী বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের অবক্ষয়) সীমাবদ্ধ ছিল না, বাংলা চলচ্চিত্রের এক স্বতন্ত্র বাগ্‌বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হ'য়েছিল। যে অর্থে এ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের জর্মানির নির্বাক চলচ্চিত্র একেবারেই জর্মান, বা বর্তমান জাপানের ওজু, মিজোগুচি বা কুরোসাওয়ার ছবি এক বিশিষ্ট জাপানী প্রকাশভঙ্গীর ইঙ্গিত দেয়, মনে হয় ঋত্বিক ঘটক সচেতনভাবে ঐ অর্থে বাংলা চলচ্চিত্রের জন্য তার নিজস্ব এক বাচনভঙ্গী তৈরীতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এ পরীক্ষা সবসময় সফল হয় নি, কিন্তু চলচ্চিত্রের মৌলিক ভাষাটাকে ভেঙ্গে চুরে, সাজিয়ে গুছিয়ে, কখনও আমাদের অতীত সাংস্কৃতিক ধারার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে, কখনও বর্তমান জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপ খাইয়ে একটা স্বদেশী চলচ্চিত্রশৈলী উদ্ভাবনের প্রচেষ্টার হদিশ পাওয়া যায়।

বর্তমান প্রবন্ধের মূল উপলক্ষ্য থেকে কিছুটা বিক্ষিপ্ত হলেও, প্রাসঙ্গিক বলে, কয়েকটা কথা বলা দরকার। চলচ্চিত্রের ভাষা এখনও শৈশবাবস্থায়। তার ব্যাকরণ আজও উদ্ভাবিত হচ্ছে। কাট্, মন্তাজ, ক্লোজ-আপ, ডিজলভ্, ডাব্‌ল্-এক্‌স্‌পোজর, ফ্ল্যাশ ব্যাক,—এই জাতীয় কিছু কলাকৌশলের পৌনঃপুনিক ব্যবহারের ফলে গত কয়েক দশক ধরে চলচ্চিত্রে প্রকাশভঙ্গীর ও তার অর্থোদ্ধারের কিছু নিয়ম গড়ে উঠেছে মাত্র। এই মৌলিক নিয়মগুলি মেনে চলে বিভিন্ন দেশে চিত্রনির্মাতারা ছবি তৈরী ক'রছেন। পাশ্চাত্যে কাহিনীভিত্তিক চলচ্চিত্রের গুণ বিচারের মানদণ্ড সচরাচর হয়ে থাকে—পরিমিতিবোধ, শুধুমাত্র মূল কাহিনীর অগ্রগতির প্রয়োজনে সঙ্গীত বা উপকাহিনীর ব্যবহার, অভিনয়ে নাটকীয়তা বর্জন এবং সর্বোপরি, চলচ্চিত্রের ভাষায় ক্যামেরার ব্যবহার (অর্থাৎ ফ্রেমগুলি যেন স্টেজে প্রদর্শিত নাটকের নিছক চলমান আলেখ্য না হয়ে, ক্লোজ-আপ্ বা লঙ ডিস্টান্স্ শট বা বিশেষ লেন্সের ব্যবহারের দ্বারা ‘মুড’ তৈরীর বাহন হয়ে ওঠে)।

কিন্তু কোথাও কোথাও গল্প-কাহিনীকেই উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে শুধুমাত্র চলমান আলেখ্য ও সঙ্গীত ও সংলাপের ধ্বনিলিপির সঙ্গে তার সমন্বয় বিন্যাস করে বক্তব্য প্রকাশের তাগিদে। আধুনিক বিজ্ঞাপন জগতের উচ্চনাদী ঘোষণা, কমিক স্ট্রিপের চরিত্র বা বামপন্থী রাজনীতির বিতর্ক ধারাবাহিকভাবে ধ্বনিলিপিতে ব্যবহার করে Golard-এর মত চিত্রনির্মাতারা সমসাময়িক

পাশ্চাত্য সভ্যতার সময়োপযোগী বাগ্‌বৈশিষ্ট্য তৈরী করছেন। এর ফলে এতদিনের প্রচলিত মাপকাঠিতে অনেক সময়ই এ ধরনের চলচ্চিত্র অনুত্তীর্ণ বলে বিবেচিত হয়। দাবি উঠছে চলচ্চিত্র বিচারের যে পুরোন মানদণ্ড, তার পরিবর্তন প্রয়োজন ; নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলিকে টাটকা চোখে দেখা ও তাদের প্রকাশভঙ্গীর কায়দা-কানুনকে চলচ্চিত্রের ব্যাকরণে স্থান দেওয়া দরকার।

অন্যদিকে জাপানে একেবারে স্বতন্ত্র এক বাগ্‌ভঙ্গিমা তৈরী হয়েছে, জাপানের অতীত গীতিনাট্য 'কাবুকি' বা 'নো'র প্রভাব যেখানে অতি স্পষ্ট। ফ্রেম রচনায় যেখানে অনেক সময় অতীতের জলরঙে আঁকা নিসর্গচিত্রের ছায়া উপস্থিত, ক্যামেরা যার সামনে গড়িমসি করে। এমনকি কুরোসাওয়া—যাঁকে বলা হয় জাপানী চিত্রনির্মাতাদের মধ্যে সবচেয়ে পাশ্চাত্য-ধর্মী—তাঁর ছবিতেও **western**-এর বন্দুকের লড়াই-এর প্রতিরূপ হয় জাপানের ঐতিহ্যগত 'চানবারা' (**chanbara**) বা তরোয়ালের যুদ্ধ, cow boy-এর প্রতিরূপ হয় 'সামুরাই'। তাদের চালচলনে কথোপকথনের ভঙ্গীতে অবশ্যম্ভাবীরূপেই এসে যায় তথাকথিত নাটকীয়তা অতীতের শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠানকে আশ্রয় করে। যদিও পাশ্চাত্যের মাপকাঠিতে অনেক সময়ই মনে হতে পারে 'সিনেম্যাটিক' নয় বলে, এদের ছবির বাগ্‌বৈশিষ্ট্যকে আমরা তাঁদের জাতীয় সংস্কৃতির ধারাবাহিকরূপে গ্রহণ করে তার মধ্যে সর্বজনীনতা কেন খুঁজব না? এই কারণেই সত্যজিৎ বাবু একদা মিজোগুচির ছবি প্রসঙ্গে বলেছিলেন—যদিও এগুলি ইউরোপীয় প্রচলিত রীতি দ্বারা অপ্রভাবিত, তবুও **"Original and fundamental enough to necessitate a thorough reassessment of the so-called first principles of cinematography."** (Film, Book I, ed. by Robert Hughes, Grove Press, New York, 1959 দ্রষ্টব্য)।

আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগে জর্মান চলচ্চিত্রে ঠিক এই ভাবে এক স্বতন্ত্র বাগ্‌বৈশিষ্ট্য গ'ড়ে উঠেছিল, যার বিশেষত্ব ছিল অভিনয়ে ও রূপসজ্জায় নাটকীয়তা, সেটের পরিকল্পনায় অতিরঞ্জন—যা সবই এসেছিল জর্মান এক্‌স্প্রেশনিস্ট্‌ চিত্রকলা ও নাটকের প্রভাব আশ্রয় করে। অতীত জর্মান কবি সাহিত্যিকদের করাল অন্ধকারাচ্ছন্ন বিষণ্ণ জগৎ ও গুপ্ত রহস্যের প্রতি প্রবণতার ঐতিহ্যের ধারা Nosferatu (১৯২২) বা Golem

১৯২০-র মত বহু ছবিতে সে যুগে একমাত্র এক্‌স্প্রেশনিস্ট্‌ আঙ্গিকেই ব্যক্ত হওয়া সম্ভব ছিল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ঋত্বিক ঘটকের প্রচেষ্টা বিচার্য। অতীতের জর্মান এক্‌স্প্রেশনিস্ট চিত্রনির্মাতা বা বর্তমানের জাপানী আচার্যদের সাফল্যের তুলনায় ঋত্বিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অসম্পূর্ণ ও অগোছালো। অনেক সময়ই বড় বেশী ব্যক্তিগত হয়ে গেছে তাঁর প্রকাশভঙ্গী, নিজের চিন্তার চারদেওয়াল টপকে সর্বজনীন হ'য়ে উঠতে পারে নি। ('অযান্ত্রিকে' আদি-বাসীদের আচার অনুষ্ঠান ও নৃত্য সম্বন্ধে ঋত্বিকের নিজের স্বীকৃতি স্মরণীয়—"এই সমস্ত প্রতীকগুলো কোথাও বিচ্ছিন্নভাবেও সার্বিক সত্যে পরিণত হয় নি। হয়তো আরও একটু সচেতন হলে—এই সমস্ত প্রতীকগুলো পরিচিত পরিবেশের চার দেওয়াল ছাড়িয়ে অন্য কোন মানে খুঁজে পেতো।") তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের আত্মমুখীনতা ও বিশৃঙ্খলতা হয়তো বহুলাংশে এর জন্য দায়ী। এ সত্ত্বেও যে আটটি ছবি তিনি সম্পূর্ণ ক'রতে পেরেছিলেন তাতে বারংবার কয়েকটি রচনাশৈলীর বৈশিষ্ট্য উপস্থিত, যা নিছক কাকতালীয় নয়, সুপরিকল্পিত বলে মনে হয়।

লক্ষণীয়, ঋত্বিকের বিষয়বস্তুর এক্তিয়ার সীমাবদ্ধ—দেশচ্যুত বা মা-হারা চরিত্র ও তাদের বিষণ্ণ জগৎ। 'নাগরিক' 'মেঘেঢাকা তারা' 'কোমল গান্ধার' 'সুবর্ণরেখা' ও 'যুক্তি-তক্কো-গপ্পে'র চরিত্ররা পূর্ব বাঙলার ভিটে মাটি থেকে বিতাড়িত ও ক'লকাতায় নাগরিক জীবনের টানা পোড়েনে তৈরী। তাদের জীবন যাত্রার ধূলি ধূসর কাহিনীই এ ছবিগুলির মূল উপজীব্য। 'অযান্ত্রিকের' নায়ক মা-হারা নিঃসঙ্গ মানুষ, শ্রমশিল্পপণ্যোৎপাদী সভ্যতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে গিয়ে যন্ত্রের সঙ্গে মানবিক সম্পর্ক স্থাপন করে। 'বাড়ী থেকে পালিয়ে'র কাঞ্চন মাকে ছেড়ে ক'লকাতায় এসে নাগরিক সভ্যতার চেহারা দেখে হঠাৎ বড় হয়ে ওঠে। 'তিতাস একটি নদীর নামে' জেলেদের জীবনদাত্রী জননী তিতাস শুকিয়ে গিয়ে তার সন্তানদের ভিটেমাটি ছাড়া করে।

এই স্বল্প পরিধির ফলে ঋত্বিকের পক্ষে সুবিধাজনক হয়েছিল মাত্র কয়েকটি বিষয়ের উপর চিন্তাশক্তি কেন্দ্রীভূত করে তাদের প্রকাশের উপযোগী একটি বিশেষ ঢং উদ্ভাবন করা! সত্যজিৎ রায় সম্বন্ধে ঋত্বিকের মন্তব্যটা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"সবচাইতে যেটা আমার মনে হ'য়েছে যে

তাঁর একই সঙ্গে প্রচণ্ড শক্তির উৎস এবং দুর্বলতার কারণ বোধ হয় তিনি নানা রকম বিষয়ের মধ্যে নানা প্রকার আঙ্গিক প্রয়োগের চেষ্টা করে চলেছেন আজো।" ("একমাত্র সত্যজিৎ রায়", মার্চ, ১৯৭২)

ঋত্বিকের আঙ্গিক নির্বাচনের ক্ষেত্র ছিল আমাদের যাত্রা-থিয়েটার ও অতীতের চলচ্চিত্র জগৎ, আদিবাসীদের আচার-অনুষ্ঠান ও নৃত্য, ভারতীয় পুরাণের প্রতীক ইত্যাদি। থিয়েটার ও পুরোন চলচ্চিত্রে বহুল প্রচলিত কিছু রীতি, যেমন কাহিনীর সন্ধিক্ষণে বা চরিত্রদের মানসিক অবস্থা প্রকাশের তাগিদে একটি সমগ্র গান গাওয়া, ঘটনা সমূহের যুগপৎ সঙ্ঘটন, কিছু 'টাইপ' চরিত্র দিয়ে অতি অভিনয় করানো,—এগুলি ঋত্বিক সার্থকভাবে তাঁর ছবিতে কাজে লাগিয়েছিলেন। 'কোমলগান্ধারে' "আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে" বা 'সুবর্ণরেখায়' হরপ্রসাদের (বিজন ভট্টাচার্য) অভিনয় ভঙ্গীতে অতীতের বাংলা থিয়েটারের অতি নাটকীয় ঢং হয়তো প্রসঙ্গচ্যুত ক'রলে অবান্তর বা 'নাটুকেপনা' মনে হ'তে পারে, কিন্তু ছবিগুলিতে কাহিনীর সামগ্রিক উপস্থাপনার মধ্যে এগুলি আশ্চর্যভাবে মানিয়ে গেছে। 'সুবর্ণরেখায়' সমাপতনের আধিক্য অনেক সমালোচনার লক্ষ্য হ'য়েছিল; বলা হ'য়েছিল বাস্তবে এমন ঘটে না। বাস্তবে কি ভ্যান্‌গগের আকাশ দেখতে পাওয়া যায়, বা পিকাসো-অঙ্কিত মানবদেহ? রঙের অতিরঞ্জন বা রেখার অতিবিকৃতি সত্ত্বেও কিন্তু ভ্যান্‌গগ্‌-পিকাসোর ছবি আমাদের মনে স্থান ক'রে নেয় বিশুদ্ধতাবাগীশদের ওজর-আপত্তি উড়িয়ে দিয়ে। বাস্তব থেকে বিচ্যুতি বা তার বিকৃতি কোথাও ছন্দপতন ঘটায় না, বরং এক নিজস্ব ছন্দ সৃষ্টি করে। চলচ্চিত্র দেখতে গিয়েও বাস্তবানুগত্যর থেকেও চিত্রনির্মাতার বক্তব্য কতটা শিল্পসম্মত হ'য়ে উঠেছে, এইটেই বিচার্য। 'সুবর্ণরেখায়' ঘটনাগুলির আকস্মিকতা কি কাকতাড়ুয়ার মত ছবির অবয়ব থেকে বেরিয়ে থাকে, না সমগ্র কাহিনীর ক্ষিপ্র ধারাবাহিকতায় এবং তার চূড়ান্ত পরিসমাপ্তিতে তা মগ্ন হ'য়ে যায়?

ঋত্বিকের ছবিতে নোঙর-হীন চরিত্রগুলির বিষণ্ণ জগতের পাশাপাশি আর একটা জগৎ প্রবহমান—জন্ম-বিবাহ-মৃত্যুর কালচক্র। জীবনের এই চিরন্তন ধারাবাহিকতার সুরটা ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে ঋত্বিক আদিবাসীদের নৃত্যানুষ্ঠানে ('অযান্ত্রিকে' ওঁরাওদের 'বৈরাথী' ও 'যুক্তি-তক্কো-গপ্পে' 'ছৌ' নৃত্য) তার উপযুক্ত আঙ্গিক খুঁজে পেয়েছিলেন, যদিও চলচ্চিত্রে তার প্রয়োগ সবসময়

সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে ওঠে নি। এর কারণ কি আদিবাসী আচার-অনুষ্ঠান ও নৃত্যগীতের অন্তর্নিহিত দর্শন সম্বন্ধে আমাদের সমাজের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত দর্শকদের অজ্ঞতা? এরই ফলে কি 'অযান্ত্রিকে' ওঁরাও নৃত্যের দীর্ঘ 'সিকোয়েন্‌স্‌টি' অনেকের কাছেই অবান্তর মনে হ'য়েছে?

এ ছাড়াও রয়েছে বেদ, উপনিষদ ও পুরাণের প্রতীকগুলিকে কাজে লাগানো। 'মেঘে ঢাকা তারা' থেকে শুরু ক'রে 'যুক্তি-তক্কো-গপ্পে' বিভিন্ন 'সিকোয়েন্‌সে', অতীতের এই জ্ঞানভাণ্ডার থেকে অজস্র ভাবমূর্তি আহরণ ক'রে তাদের সম্বদ্ধ করা হ'য়েছে কখনও ধ্বনিলিপিতে, কখনও মুখোশের ব্যবহারে, কখনও সংলাপে বা নেপথ্য সংগীতে।

প্রশ্ন থেকে যায় ভারতীয় বা বিশেষ ক'রে বাঙালী দর্শকদের কাছে এ বাচনভঙ্গী কতটা গ্রাহ্য হ'য়েছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ভারতীয় চলচ্চিত্র-নাটকের জনপ্রিয় রীতিগুলির সুকৌশল ব্যবহার, আদিম লোকসংস্কৃতির উপাদানের সংমিশ্রণ, অতীতের ঐতিহ্যাশ্রয়ী পুরাণের প্রতীকের উপস্থাপনা—ঋত্বিকের ছবির এ বৈশিষ্ট্যগুলির জনস্বীকৃতি পাওয়া উচিৎ। কিন্তু যতদূর জানি এক 'মেঘে ঢাকা তারা' ছাড়া ঋত্বিকের কোন ছবিই ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করে নি। 'ডিস্ট্রিবিউটার' বা চলচ্চিত্র-সমালোচকদের ষড়যন্ত্র ব'লে একটা সহজ সমাধান বার করা যায়। কিন্তু আরও একটু তলিয়ে দেখলে প্রশ্ন করা যায় আমাদের দর্শক সাধারণ এ বাচনভঙ্গী গ্রহণ ক'রতে কতটা সক্ষম? মনে রাখা দরকার ঋত্বিক ঘটক নিজে একদা দর্শকদের উদ্দেশ্য ক'রে ব'লেছিলেন—"আপনারাও একটা বড় পাঁচিল। বোধহয় সবচেয়ে বড় পাঁচিল।" (সারি সারি পাঁচিল)

আমার মনে হয় ঋত্বিক ঘটক তাঁর ছবির জন্য যে আঙ্গিক তৈরীর চেষ্টা ক'রেছিলেন তা এ দেশের মাটির শিকড় থেকে আহৃত হ'লেও, তাঁর ছবির দর্শকদের মানসিকতা সে শিকড় থেকে বিচ্ছিন্ন। এ প্রসঙ্গে বাঙালী সমাজের স্তর বিন্যাসের কথা এসে যাচ্ছে। বাঙলা চলচ্চিত্রের দর্শক মূলতঃ কলকাতার ও মফঃস্বলের মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এদের কাছে অদিবাসীদের দর্শন বা তাদের সাংস্কৃতিক প্রতীক প্রায় বিদেশী ভাষা। এমন কি আজকের বাঙালী দর্শকের মননে বেদ উপনিষদের বাণী বা পুরাণের কাহিনীও প্রায় অনুপস্থিত। পাঁচালি, বারো মাসের তেরো পার্বণ, আগমনী-বিজয়ার গান, বিবাহের গান আজ কয়টি শহরে মধ্যবিত্ত ঘরে গীত হয়?

এক এক সময় মনে হয় গ্রাম বাংলার মানুষ—যারা আজও যাত্রা-কথকতা পালাকীর্তন শুনতে অভ্যস্ত—হয়তো তাদের কাছে ঋত্বিকের ছবিতে ব্যবহৃত দেশাচারগুলি বোধগম্য হবে। কিন্তু তাঁর ছবির বক্তব্যবিষয়—যা একান্তই বাস্তুহারা শহুরে মধ্যবিত্তর মানসিক সমস্যা—কি গ্রামীন দর্শকের কাছে গ্রাহ্য হবে?

ঋত্বিক ঘটকের বাগ্‌বৈশিষ্ট্যের যে দিকটি বাঙালী মধ্যবিত্ত দর্শকের কাছে গ্রহণীয় তা হলো অতীতের থিয়েটার-চলচ্চিত্র থেকে আহৃত ভঙ্গিমাগুলি—গান ব্যবহার, অতিনাটকীয়তা, কাকতালীয় সমাপতন, ইত্যাদি। বাংলা চলচ্চিত্রে এগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত ও অতিপরিচিত নজির; তাই দর্শক সহজেই এগুলি অনুধাবন করে। কিন্তু এর মাধ্যমে ঋত্বিক যে বক্তব্য হাজির করেন তা অনেক সময়ই এই মধ্যবিত্তর আত্মতৃপ্তি ও পরিচ্ছন্নতাবোধকে পীড়া দেয়। 'কোমল গান্ধারে' চিত্রিত গণনাট্য আন্দোলনের দলাদলি ও ভাঙ্গন এতই বাস্তবানুগ যে তা গণনাট্যসংঘে তাঁর প্রাক্তন সহকর্মীদের বিরোধীভাবাপন্ন ক'রে তুলেছিল। ভাই বারবণিতা বোনের ঘরে প্রবেশ ক'রছে—'সুবর্ণরেখার'এ দৃশ্য মধ্যবিত্তের সযত্নপালিত আদর্শকে ধাক্কা দেয়। রূঢ় বাস্তবকে দেখবার জন্য এ দর্শকেরা সিনেমাহলে যান না। যদিও চলচ্চিত্রে চটুল যৌনাত্মক রসিকতা বা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক 'ক্যাবারে' নৃত্যর উপভোগ এঁদের রুচিতে বাধে না।

বর্তমান বাঙালী সমাজে চলচ্চিত্র ও দর্শকদের সম্পর্কের বিভিন্ন স্তরে এই যে দ্বন্দ্ব, তার সঙ্গে ঋত্বিক ঘটক নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন নি। তাঁর বক্তব্য প্রকাশ ও আঙ্গিক সন্ধানের যাত্রাপথের শেষ অধ্যায়, 'যুক্তি-তক্কো-গপ্পে' মেনে নেওয়া ও মানিয়ে নেওয়ায় তাঁর বেপরোয়া অসম্মতি আরও স্পষ্টরূপে বেরিয়ে আসে। বামপন্থী বুদ্ধিজীবী হিসেবে নিজের অক্ষমতার আত্ম-মূল্যায়ণ এবং সমকালীন বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের দেউলেপনার ক্ষমাহীন অনাবৃত-করণ (১৯৭১-এ পূর্ববাংলার ঘটনার পশ্চাৎপটে মদ্যপ শিল্পী-সাহিত্যিকদের বেহায়াপনার দৃশ্য বা ট্রেড-ইউনিয়ন নেতার কুৎসাপ্রচারপূর্ণ বক্তৃতার সঙ্গে কুকুরের ঘেউ ঘেউর প্রতিযোগিতা) এত অনাড়ম্বর ও কঠিনরূপে উপস্থাপিত হ'য়েছে এ ছবিতে যে, এর আগে এর নজির চোখে পড়ে নি। বেদ-উপনিষদ-পুরাণ থেকে আঙ্গিক সঞ্চয়ের প্রবণতা ঋত্বিক ঘটককে পেয়ে বসেছিল, তার প্রতিও অকরুণ ঠাট্টা বর্ষিত হ'তে দেখি সেই দৃশ্যে যখন সংস্কৃতের পণ্ডিত জগন্নাথ (বিজন ভট্টাচার্য) মুখোমুখি হন

ছৌ-মুখোশের শিল্পী পঞ্চাননের (জ্ঞানেশ মুখার্জি)। উচ্চশ্রেণীর সংস্কৃত শ্লোক অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয় এদেশের আদিবাসীদের শিল্পচর্চায় বা আচার অনুষ্ঠানে। "তোমার ঐ অং বং বন্ধ করো তো। ইসব আমার ঘরের না—" বলেন পঞ্চানন। জগন্নাথ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেন—"সংস্কৃত বিদেশী?" পঞ্চানন বলেন—"হাজার বার—এখানে সংস্কৃত কে বলে।"

সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে মুখোমুখি এনে যেন ঋত্বিক বোঝাতে চেয়েছেন আজকের Communication gap, ভাব আদান-প্রদানের ভাষার অসুবিধা, যা চলচ্চিত্রের ভাষা সৃষ্টির কাজকে আরও জটিল ক'রে তুলেছে। একদিকে ক'লকাতার বেকার ছেলে নচিকেতা ও অন্যদিকে পূর্ববঙ্গ থেকে পলাতকা বঙ্গবালার আকর্ষণ-বিকর্ষণের টানা পোড়েন। গৃহচ্যুত, অভাবগ্রস্ত নীলকণ্ঠর সঙ্গে তার অতীতের সহযোদ্ধা, একদা প্রগতিশীল বর্তমানে সমৃদ্ধশালী সাহিত্যিক শত্রুজিৎ-এর সাক্ষাৎ। সংস্কৃতের পণ্ডিত জগন্নাথের সঙ্গে ছৌনৃত্যের মুখোশ নির্মাতা পঞ্চাননের কথোপকথন, এবং সবশেষে শালবনে সশস্ত্র বিপ্লবী যুবকদের সঙ্গে নীলকণ্ঠের যুক্তি-তক্কো ও গপ্পো। বিভিন্ন ধরনের এই 'এন্‌কাউন্টার'গুলি বর্তমান বাঙালী সমাজের জটিল স্তর বিন্যাসকে তুলে ধরে। আর এ সবকিছুর সাক্ষী এক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ কৃষক—তাঁর কুঁড়ে ঘরে ব'সে অপেক্ষা করছেন অনন্তকাল ধ'রে—নির্বাক 'কোরাসের' মত এসেছেন ছবির শুরুতে, মাঝে একবার আর শেষে। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তিনজন কালো মুখোশধারীর নৃত্য। ছবির শেষ নৃত্যে তারা বারংবার দর্শকদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে, যেন এ সবকিছুর জন্য দায়ী তারা—বাঙালী মধ্যবিত্ত!

এই মধ্যবিত্ত সমাজের, বামপন্থী রাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য—এমনকি দুই বাংলার সাংস্কৃতিক মিলনের স্বপ্ন সবকিছুর প্রতি একটা নিদারুণ বিরাগ ও বিরক্তি সমস্ত 'যুক্তি-তক্কো-গপ্পে' ব্যাপৃত হ'য়ে আছে। এই সর্বগ্রাসী বিরূপতার মধ্যে একটু স্নেহ সঞ্চিত আছে কেবলমাত্র সশস্ত্র বিপ্লবী ছেলেগুলির প্রতি ("আমার বাংলার তোমরাই তো সব—আর তো কিছু নেই। তোমরা ভবিষ্যতকে ছিনিয়ে আনবে। সে যে কোরেই হোক। তাই তোমরা কি ভাবছ আমি বুঝতে চাই।") কিন্তু তাদের ভাষা নীলকণ্ঠ বোঝেন না। শেষে হতাশ হ'য়ে বলেন—"আমি confused, fully confused, দিশেহারা হ'য়ে হাতড়ে বেড়াচ্ছি। হয়তো আমরা সবাই confused।"

সমকালীন রাজনীতির ভাষার সঙ্গে সঙ্গে চলচ্চিত্রের ভাষা বোঝা ও খোঁজার চেষ্টা আজীবন ক'রে গেছেন ঋত্বিক ঘটক। এই খোঁজার পথে অনেক সময়ই উগ্র ব্যক্তিকেন্দ্রীকতায় মগ্ন হ'য়েছেন, ফলে যে সব প্রতীক বা ভাবমূর্তি তাঁর ছবিতে বেরিয়ে এসেছে তা নিতান্তই ব্যক্তিগত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। শিল্পীমাত্রেই কিছুটা আত্মকেন্দ্রীক হন। সমসাময়িক গণ-আন্দোলনের জোয়ারে এই আত্মকেন্দ্রীকতা থেকে শিল্পী বেরিয়ে এসে ব্যাপক জনগণের ধ্যানধারণার সংস্পর্শে এসে সর্বজনীন শিল্পকর্ম সৃষ্টিতে সক্ষম হন। এ পরিস্থিতি না থাকলে, সমষ্টির শৃঙ্খলার অভাবে প্রায়শঃই শিল্পীর জীবন-ধারায় ও চিন্তারাজ্যে অরাজকতা এসে হানা দেয়। যে ঋত্বিক ঘটক একদা গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম সারিতে ছিলেন ও কমিউনিস্ট পার্টির কাছাকাছি ছিলেন, সেই ঋত্বিক তাঁর শেষ জীবনে এত বিভ্রান্তি ও বীতরাগ নিয়ে মারা গেলেন কেন—এ প্রশ্নের জবাব দেবার দায়িত্ব এদেশের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের যাঁরা আজ পর্যন্ত ভারতীয় জনগণের বিপ্লবী প্রচেষ্টাকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারলেন না, এবং প্রতিভাবান শিল্পী-সাহিত্যিকদের তাঁদের দলে পেয়েও একদিকে জনগণের সঙ্গে তাদের একাত্ম করার দায়িত্ব এবং অন্যদিকে শিল্প সৃষ্টির প্রয়োজনীয় পুষ্টিবিধান—এই দুই-ই অবহেলা ক'রলেন।

ঋত্বিক ঘটকের বাহাদুরি এত হতাশার মধ্যেও, নেতৃত্বের বেইমানি সত্ত্বেও আরও পাঁচজন প্রাক্তন কমিউনিস্টের মত তিনি মার্কসবাদ বিরোধী শিবিরে গিয়ে যোগ দেন নি বা ব্যবসায়িক সাফল্যের পিছনে ছোটেন নি। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে তিনি তাঁর চলচ্চিত্রের জন্য নিজস্ব একটা জীবন দর্শন তৈরী করেছিলেন। ইয়ুং এর যৌথ অবচেতনা বা মাতৃকা মূর্তির archetypal image-এর কথা শুনে অনেক গোঁড়া মার্কসবাদী হয়তো ক্ষেপে উঠবেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার ঋত্বিক লড়াই চালিয়েছেন, তাঁর নিজের ভাষায় 'এক বিড়ম্বিত কালে', সম্পূর্ণ একাকী মার্কসবাদী নেতৃত্বের কোন তাত্ত্বিক প্রভাব ছাড়াই (ইটালীর বামপন্থী চিত্র পরিচালকদের উপর 'গ্রামচী'র মত মার্কসবাদী চিন্তানায়কের প্রভাব স্মরণীয় এ প্রসঙ্গে), অজস্র পাঁচিল টপকাতে টপকাতে। মনে রাখা দরকার, রাজনীতির গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিটা শেষের দিকে স্বচ্ছ হ'চ্ছিল, যুক্তি তক্কো-গপ্পে নীলকণ্ঠ ব'লছে—"এই যে ৪৭ সালের বিশাল বিশ্বাসঘাতকতা, জাতীয় মুক্তি আন্দোলন National Liberation Movement এর পিছনে ছুরি মেরে

বুর্জোয়াদের ১৫ই আগস্টের বিরাট—Great Betrayal—স্বাধীনতা—Indedence—ফুঃ!" ১৯৭৪-এ সেপ্টেম্বরে এক সাক্ষাৎকারে ঋত্বিক বলেন—"গোটা সমাজ ব্যবস্থাটা ভেঙে পড়ছে চুরমার ক'রে—দুটো পথ খোলা—হয় Leninist পদ্ধতিতে নিয়ে যাবার একটা ব্যাপার আছে, নইলে clean fascism হবে।" (চিত্রবীক্ষণ, সেপ্টেম্বর '৭৪)

Leninist পদ্ধতিটা কি বুঝবার জন্যই নীলকণ্ঠরূপী ঋত্বিক শেষে গিয়ে হাজির হয় মার্কসবাদী লেনিনবাদী যুবকদের ডেরায়। যদিও তাদের রাজনৈতিক বক্তব্য প্রায় কিছুই শোনা যায় না (তাদের আসল রাজনীতি ঋত্বিক সম্পূর্ণ জানতে পারেন নি ব'লে, না তা প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না ব'লে ?) তাদের প্রতি নীলকণ্ঠের আবেগপ্রবণ অনুরাগ, তাদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশের মধ্য দিয়ে অনেক কিছু বার হ'য়ে আসে। তাদের সঙ্গে এই "ভাঙ্গা বুদ্ধিজীবী'টির আত্মিক সংযোগ স্থাপনের চেষ্টার অন্তিম দৃষ্টান্ত পুলিশের সঙ্গে লড়াই-এর মধ্যে তাদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নীলকণ্ঠের গুলি খেয়ে মৃত্যুবরণ। মনে পড়ে যায় টুর্গেনিভের রুডিনের কথা—বিদ্রোহীদের সঙ্গে ব্যারিকেডে দাঁড়িয়ে যে শহীদ হ'য়েছিল।

ঋত্বিকের বাহাদুরি এই যে তিনি তাঁর চিন্তাশক্তিটাকে সচল রেখে বুঝেছিলেন "একটা কিছু করতে হবে।" শিল্পীর পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব এ বিড়ম্বিত কালে, তিনি তা করে গেছেন তাঁর শিল্প কর্মে।

প্রবন্ধ

কলকাতার জলছবি

শিবপ্রসাদ সমাদ্দার

আমার একটা বাতিক খবরের কাগজের কাটিং রাখা। কর্পোরেশনে আসার পর জল সরবরাহের কাটিংয়েই ঝোঁক ছিল বেশী। ১৯৭৪ সালের গোড়া থেকেই দেখি জঞ্জাল, জলনিকাশ, রাস্তা সব সমস্যা নিয়েই ক্ষোভ, চাপ, সংকটের কমতি নেই। শীত পেরিয়ে যেই গ্রীষ্মের আমেজ এল, দেখি সবার উপরে জলের যোগান তাহার উপরে নাই। সারা বছর জলচিন্তা চমৎকারা, তবে এপ্রিল থেকে জুলাই রীতিমত জলাতঙ্ক। শীতের শেষে নদীতে ও মাটির নীচে জলতল নেবে যায়। ফল জলকষ্ট, যথেষ্ট পরিমাণ জল তোলার অভাবে। প্রখর গ্রীষ্মে অ্যালগী বা ক্ষুদে শ্যাওলা ফিলটার বেডে বাসা বাঁধতে পারে। ফল জলকষ্ট, ট্রীটমেন্ট প্ল্যান্টে কাঁচা জলের চলাচল ব্যাহত হওয়ায়। বর্ষার প্রাক্কালে জলাভাব যখন চরমে ওঠে জীবাণুদুষ্ট জলে কলেরা টাইফয়েড যেন জাঁকিয়ে বসতে চায়। প্রথম বর্ষায় কচুরিপানার আক্রমণ জলকলে থিতানোয় ঝিলে কাঁচা জলের সরবরাহ যায় কমে, অথবা প্রচুর পলি বয়ে আসে ঘোলা জল: থিতানোর ঝিলকে তাকত দিতে চাই আরও ফটকিরি। ফল জলের সরবরাহ হ্রাস, নয় স্বচ্ছতা নাশ।

জলযুদ্ধের নির্ঘোষ

আজ এই আড়াই বছর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়েছে, বিশেষতঃ ১৯৭৪-এর জুলাই থেকে ফরাক্কা বাঁধ মারফত তাজা জলের সরবরাহ। টালা

পলতার সংস্কার চলছে বার মাস ত্রিশ দিন। জলের যোগান বেড়েছে, আরও বাড়াবার চেষ্টা চলছে। সেকথা এখনই নয়। ১৯৭৪ এর এপ্রিল থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত জলের তেজী কাটিংগুলি ঘাটছিলাম। সুধীসজ্জন-মণ্ডলী তথা তাবৎ পৌর জনের বিনোদনার্থ এই সহ কিঞ্চিৎ উপস্থাপিত করি। কতগুলির হেডিং তো চেঁচিয়ে কথা বলবে:

লোড শেডিং যত বাড়ছে পানীয় জল তত কমছে। বক্তব্য: পানীয় জলের অবস্থা যত দিন যাবে তত শোচনীয় হয়ে উঠবে। অপরিষ্কার জলের সরবরাহ এখন দৈবের হাতে। ওয়াটগঞ্জ ও মল্লিকঘাট প্রায়ই অচল। দমকল আগুন নেভানোর জল পাবে না।

পানীয় জলের দাবিতে সোমনাথ লাহিড়ীর নেতৃত্বে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ঘেরাও। বক্তব্য: উত্তেজিত বিক্ষোভকারীরা চাপড়ালে প্রশাসকের টেবিলের কাঁচটি ভেঙে যায়। দু ঘন্টা তাঁকে ঘেরাও করার পর ৬টি নলকূপ বসানোর প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাঁরা প্রশাসককে রেহাই দেন।

শহরে জলের তীব্র সংকট। বক্তব্য: পলতার পাম্পিং স্টেশনে কলকব্জা বিকল। শহরে জলসরবরাহ আরও বিপর্যস্ত হবে। কারণ স্টেলিং ট্যাংক ছোট ছোট উদ্ভিদ জাতীয় পদার্থে ছেয়ে গেছে। মারবার জন্য তুঁতে ও ব্লিচিং পাউডার চাই, পৌর ভাঁড়ারে নাই। দুটি পুরনো র‍্যাপিড গ্র্যাভিটি ফিলটার বেড আট মাস চালু নেই। ফিলটার বেডে ৩০ ইঞ্চি বালি থাকার কথা, ২০ ইঞ্চির বেশী নেই।

পানীয় জলের ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার মুখে। বক্তব্য: ১৯৭০ এ শোনা যেত পলতা দিনে একশ মিলিয়ন গ্যালন জল দেয়, শীঘ্র দেবে একশ চল্লিশ। আজ চুয়াত্তরের জুনেও পুরসভার এক কথা একশ মিলিয়ন গ্যালন। বাড়তি চল্লিশ মিলিয়ন দেওয়ার সম্ভাবনা নেই। কেন? জল থিতানোর পুকুরগুলি পলি জমে মাঠ হয়ে গিয়েছে। যে ছয়টি যান্ত্রিক ক্ল্যারিফায়ার জল শোধন করবে তার ক্ষমতাও দারুণভাবে কমে গেছে। আশী-পঁচাশী মিলিয়নের বেশী পলতার ক্ষমতা নেই।

জীবন লইয়া খেলা। বক্তব্য: জলের অপর নাম জীবন, তেমনই মৃত্যুও বটে। নেকরোপলিস বা মৃত্যুনগরীর পরিণতি যে এ শহর এখনও এড়াইতে পারিতেছে সে শুধু কলকাতাওয়ালীর কৃপায়। কিন্তু পৌর কর্তৃপক্ষ ঘুমন্ত—লাল বাড়ীতে নাসিকাগর্জন ছাড়া আর কিছু শোনা যাইতেছে

না। গঙ্গাজল যার পর নাই ঘোলা, ফিলটার বেড কাজ করিতেছে না, ফটকিরির ভাণ্ডার শূন্য। ফল নাগরিকদের অমৃতজ্ঞানে আবিল গঙ্গোদক পান। পৃথিবীর অনেক শহর সাফ হইয়া গিয়াছে মহামারীতে। কে জানে এবারই হয়তো কলিকাতায় শোনা যাইবে তাহার শেষ ওয়ার্ণিং।

পৌর জলকাহিনী। বক্তব্য: অফিসারদের মধ্যে রাজনীতি, কর্মীদের মধ্যে দলাদলি। ফলে পলতা—টালার সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, শতকরা মাত্র পঞ্চাশ ভাগ জল পাওয়া যাচ্ছে। পুরনো ইনটেক স্টেশনে তিনটির মধ্যে একটি বিদ্যুৎচালিত পাম্প ও একমাত্র বাষ্পচালিত পাম্প অচল। পুরনো প্রেশার স্টেশনে আটটি বয়লারের মধ্যে ছয়টি অচল। ফলে পলতা দৈনিক ১৪ কোটি গ্যালন জলের জায়গায় ১০ কোটির বেশী কোন দিনই দিতে পারছে না।

আগামী গ্রীষ্মে কলকাতায় খাবার জল মিলবে না। বক্তব্য: অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত না হলে ১৯৭৫ সালে কলকাতায় পানীয় জল সরবরাহ সম্ভব হবে না। কল্লোলিনী কলকাতার প্রাণস্পন্দন থেমে যাবে, শুরু রুক্ষ নগরীতে শুরু হবে মহামারীর প্রেতনৃত্য। এই সিদ্ধান্তে আসার কারণ হল জল শোধনের পুরনো ও নতুন দুটি পদ্ধতিতেই ভুত ঢুকেছে। পুরনো প্রক্রিয়ায় গঙ্গার ঘোলা জল প্রিসেটলিং ট্যাঙ্কে ও ফাইনাল সেটলিং ট্যাঙ্কে অনেকটা থিতোবার পর ফটকিরি প্রয়োগে স্বচ্ছ করা হয়। তারপর স্লো স্যানড ফিলটারে পরিষ্কৃত হয়ে এবং ক্লোরিন মিশিয়ে জীবাণু মুক্ত হয়ে প্রেশার স্টেশনে যায়, সেখান থেকে পাম্পে করে টালায়। নূতন পদ্ধতিতে কাঁচা ঘোলা জলে প্রথমেই অনেকটা ফটকিরি মেশানো হয়, তার পর অতিমৃদু মন্থনে ক্ল্যারিফ্লকুলেটর জল থেকে পলিকে আলাদা করে র‍্যাপিড গ্র্যাভিটি ফিলটারে পাঠায় পরিষ্কৃত করার জন্য। সেখান থেকে ক্লোরিন মিশিয়ে প্রেশার স্টেশন ও টালা। পুরনো পদ্ধতির ৪টি থিতানো পুকুরের মধ্যে ৩টি অচল, একটিতে ১২ ফুট গভীরতার প্রায় সবটাই মজেছে, একটির ২।৩ ফুট দিয়ে যা কাজ চলে। নতুন প্ল্যান্টের যন্ত্রপাতিও খারাপের দিকে। পলি সরাবার ব্যবস্থায় গলদ, ফলে ক্ল্যারিফ্লকুলেটরের কাজ থাকে অসম্পূর্ণ।

দুর্নীতি ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতার শেষ কোথায়? বক্তব্য: ট্যাক্সের

পরিমাণ বাড়ছে, কলকাতা জাহান্নামে যাচ্ছে। পানীয় জলের অভাব। এখন যদি হাওয়া বন্ধ করা যায়, ষোলকলা পূর্ণ হবে।

কলকাতায় জল জোগাবে কে? বক্তব্য: পৌর সভার কল্যাণে নাগরিকদের ঘোলা জল খেতে হয়েছে। কোন কোন এলাকায় কল থেকে নোনা জল পড়ার খবর পাওয়া গেছে। জলের জোগান যদি নিয়মিত হয় তবে সি এম ডি এ'র হাতে টালা পলতার পুরো দায়িত্ব দিতে নাগরিকদের আপত্তি হবে না, কিন্তু প্রশ্ন এই যে দি কর্পোরেশন অফ ক্যালকাটা নামক তামাশাটার তাহলে আর প্রয়োজন কি?

ভরা থাক সংস্কৃতিসুধায় বছরের পাত্রখানি—কার্টুন, সম্পাদকীয় ও রঙ্গ রচনায়। ঘোলা জলেই প্রতিভার স্ফূরণ সবচেয়ে বেশী। একটি দৈনিক পত্রে প্রথম পাতায় কাগজের নামের ঠিক নীচেই এক কার্টুন—গাধার জলপানের তিন অবস্থা। ক্যাপশন—গাধা কখনও জল ঘোলা না করে খায় না। পরশুরামের মানিনী দেবী যেমন এমব্রয়ডারির তলায় বিড়াল কথাটি সূঁচে লিখে দিয়েছিলেন জনসমঝোতার জন্য, খবরের কাগজও গাধাটিকে নামাঙ্কিত করে ছেপেছেন 'কর্পোরেশন'।

এর সংগে স্বয়ংসম্পূর্ণ পাদটীকা যদি চান তবে পড়ুন অন্য এক দৈনিকে প্রকাশিত 'জিস দেশমেঁ গঙ্গা বহতী হ্যায়': কর্পোরেশনের পানীয় জল সরবরাহের ব্যাপারে সম্প্রতি যে ঘোলাতঙ্ক সৃষ্টি করা হয়েছিল তার তদন্ত কমিটির রিপোর্ট হাতে এসেছে। কমিটি এই সূত্রে জল ব্যবহারকারী অনেকের সঙ্গেই কথা বলেছেন—ঠেলাওয়ালা ও কাবুলিওয়ালা, গৃহস্থ বধূ ও বারবধূ, রাজনীতিপন্থী ও নকশালপন্থী, কনসটেবল ও কলেজের ছাত্র। কারো কোন গুরুতর রোগের খবর পাওয়া যায়নি। তদন্ত কমিটি জল ঘোলা হবার সম্ভাব্য কারণ সুন্দর ভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

(ক) হরিদ্বার, গড় মুক্তেশ্বর, কানপুর প্রভৃতি শহরগুলির আবর্জনা আজকাল গঙ্গায় বেশী মাত্রায় পড়ছে।

(খ) এলাহাবাদে যমুনা গঙ্গায় মিশেছে। প্রকাশ যে যমুনায় কাদার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

(গ) বিহারে গণ্ডক, বাগমতী, কোশী গঙ্গায় মিলিত হয়েছে। এই

নদীগুলির উৎপত্তিস্থল তিব্বতে। চীনের আভ্যন্তরীন কোন রাজনৈতিক গোলযোগেও এই নদীগুলি ঘোলা জল বয়ে আনতে পারে।

সুজলাং সুফলাং

রহস্য থাক। আড়াই বছর পার হয়েছে। আমাদের জলের ব্যবস্থা এখনো ভেঙে পড়েনি। বরং ১৯৭৫ ও ৭৬এর গ্রীষ্মে বিক্ষোভ ঘেরাও তো দূরের কথা, দরখাস্ত, আবেদন, ডেপুটেশন বলেও বিশেষ কিছু হয়নি একথা বলতে পারি। জরুরী অবস্থার জন্যই এত শান্ত ভাব অথবা রাতারাতি আমাদের পলতার জলকল, টালার পাম্পিং ব্যবস্থা বা নলকূপের ভীষণ উন্নতি ঘটেছে একথা বলব না। নলের জলের পরিপূরক হিসাবে নলকূপ—হাতে টেপা কিংবা বৃহৎ ব্যাস টিউবওয়েল—সেগুলি থেকে জলের জোগান কিছুটা বাড়লেও আসল উন্নতি ঘটেছে টালা পলতার ক্রমোন্নতিতে।

"মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর" বলে কাগজে যা আঁকা হয়েছিল, সত্যিকারের জলছবি কিন্তু তার চেয়ে সরস ও সজল। টালা পলতা জরাগ্রস্ত, কায়কল্পের যে বন্দোবস্ত করা হয়েছে তাও হাতে হাতে ফল দেয়নি, তবুও ক্রমান্বয়ে জট বা বটল নেক ছাড়ানো হচ্ছে যাতে এই পুরোনো প্রকল্প থেকেই এবার পূজার মাসে আমরা ১৩০ মিলিয়ন গ্যালন জল রোজানা জোগাড় করেছি। মার্চ থেকে নভেম্বর এই নয় মাস পলতা থেকে জল সরবরাহের হিসাব নিচের টেবলে তুলে ধরলাম। এ বছরের পাশাপাশি ১৯৭৫-এর জল জোগান দেখুন—মিলিয়ন গ্যালনে দৈনিক গড়ঃ

মাস	১৯৭৫	১৯৭৬
মার্চ	১০০·২০	১১৭·৩৫
এপ্রিল	১১৪·২৯	১১৯·৯৪
মে	১০৬·৩০	১২৬·৩১
জুন	১০৪·২৯	১২০·৮৬
জুলাই	১১২·৫৩	১১৮·৫১
আগস্ট	১০৭·৮৭	১২৩·১৮
সেপ্টেম্বর	৯৯·৯০	১২০·০১
অক্টোবর	১১৮·৩৪	১৩১·১০
নভেম্বর	১১৫·৫৯	১২৩·১০

এই সাথে প্রতি বছর পুরসভার ১০০টি ওয়ার্ডের প্রতিটিতে তিনটি থেকে পাঁচটি করে টেপা কল বসানো হয়েছে এবং সি এম ডি এ ও সি আই টির সহায়তায় বসানো বড় বেড়ের নলকূপ খারাপ জল দেয়নি। বড় নলকূপ ইলেকট্রিক পাম্পে চলে। চালানোর খরচ বছরে ২৫০০০ টাকা যার মধ্যে প্রায় সবটাই বিদ্যুতের দরুন,—মাসে দু হাজার টাকা। আমাদের এই অর্থকষ্টেও আমরা ফি বছর সি আই টির তৈরী প্রায় ৩০টি ছোট এবং সি এম ডি এ'র তৈরী ৩টি বড় নলকূপ চালানোর ভার হাতে নিয়েছি।

লালদীঘি—গোলদীঘি, পলতা—টালা

কলকাতার জলসরবরাহের ইতিহাস শুনতে হলে যেতে হবে জব চার্ণকের আমলে। ২৪ আগস্ট ১৬৯০তে চার্ণক যখন সুতানুটিতে নোঙর ফেললেন, গঙ্গার ও পুকুরের জল তখন সম্বল। ১৭০৯ সালে ডালহৌসী স্কোয়ার এলাকায় ইংরেজরা ভাল জলের সন্ধান পেল একটা বড় পুষ্করিণীতে যার নাম লালদীঘি। এই দীঘি সংস্কার করে ফোর্ট উইলিয়মে ও কুঠিয়াল ইংরেজদের জলের সুরাহা হল। ১৮০৫ থেকে ১৮৩৬ সালের ভিতরে টাউন ইমপ্রুভমেন্ট ও লটারি কমিটি আরও দীঘি খুঁড়ল কর্ণওয়ালিস স্কোয়ার (হেদুয়া অধুনা আজাদ হিন্দ বাগ), ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলেজ স্কোয়ার (গোল দীঘি), ওয়েলেস্‌লি স্কোয়ার (গোল তালাও অধুনা হাজী মহম্মদ মহসীন স্কোয়ার) ইত্যাদি। ধোয়াপাখলা ও রাস্তায় জল দেবার জন্য গঙ্গার উপর নির্ভর। ১৮২০ সালে চাঁদপাল ঘাটে একটা ছোট পাম্প কল বসানো হল, জল তুলে খোলা নালীর মধ্যে দিয়ে ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট, ধর্মতলা, চৌরঙ্গী, লালবাজার, বৌবাজার এলাকায় বয়ে নেওয়া হত। এই কলই মল্লিক ঘাট ও ওয়াটগঞ্জের অপরিস্রুত জলের পাম্পিং স্টেশন দুটির পূর্বসুরী।

১৮৪৮ সালের এক আইনে পরিস্রুত ও শুদ্ধ জলের অপরিহার্যতা ও জোগানোর দায়িত্ব স্বীকার করা হয়। কলকাতা থেকে ১৪ মাইল উত্তরে ব্যারাকপুর মহকুমা শহরের অনতিদূরে গঙ্গার পারে পলতা গ্রামটি বিশেষজ্ঞরা বাছাই করলেন শহরের জন্য আধুনিক ধরনের জলকল বসাবেন বলে। ওঁরা দেখলেন ওখানে গঙ্গার গতিপথ স্থির, পার দৃঢ় এবং ওখান থেকে কলকাতা পর্যন্ত অতি মৃদু ঢাল যাতে করে পাইপ পথে জল পাঠানোতে কোন অসুবিধা

হবে না। ১৮৬১ ও ৬২ সালে সব রকম বিশ্লেষণ করে দেখা গেল জল মিষ্টি ও পরিষ্কার, সারা বছরই সামুদ্রিক নোনা জলের নাগালের বাইরে। সম্প্রতি অবশ্য ভাগীরথীর জলধারা ক্ষীণ হয়ে আসায় অনেকটা অপকর্ষ ঘটেছিল। ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত হিসেবে নূনের ভাগ ন্যূনতম এক লাখে এক ভাগ, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় ১০০ পি পি এম অর্থাৎ ১৪ পার্ট পার মিলিয়ন। বর্ষার ঢল নামবার আগে এটি বেড়ে হত ২৩৪০ পি পি এম। শীতকালে জল যখন সব চেয়ে স্বচ্ছ থাকে তখনকার হিসেব ৫০০ পি পি এম। ১৯৭৫ ও ৭৬এ লবণাক্ততা অনেকখানি কমেছে, ফরাক্কা প্রকল্পের দৌলতে পরিমিত পরিমাণ হলেও গঙ্গার তাজা জল আসছে বলে। এই ব্যাপারটিতেই বোঝা যাবে শুধু নাব্যতা নয়, পানীয় জলের প্রয়োজনেও ভাগীরথীর জন্য ফরাক্কার জল চাই।

পুরসভার ইঞ্জিনীয়ার-সেক্রেটারি ডব্লু সি ক্লার্ক ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে এক রিপোর্ট দেন যার ভিত্তিতে ১৮৬৭ সালে পলতায় কল বসানোর কাজ শুরু হল। ৪২ ইঞ্চি গ্র্যাভিটি মেইন দিয়ে ১৮৭০ সালে টালাতে জল পাঠানো হল। ১৮৮৮ সালে ৪৮ ইঞ্চি আর একটি মেইন বসানো হল এবং হ্যালিডে স্কোয়ার (এখন মহম্মদ আলী পার্ক) ও ওয়েলিংটন (এখন সুবোধ মল্লিক) স্কোয়ারে জলাধার ও পাম্পিং স্টেশন বসানোতে ক্লার্ক সাহেবের স্কীম পূর্ণ হল, ৩৪, ২৭, ২০০ টাকা মোট খরচ। ১৯০৮ সালে প্রাদেশিক বাংলা গভর্ণমেন্ট দৈনিক ৩২ মিলিয়ন গ্যালন জল জোগাবার জন্য ম্যাককের স্কীম মঞ্জুর করলেন ৬৯,১৭,৮৯৪ টাকা ব্যয়ে। পরিমিত প্রেশারে যাতে নিয়মিত জল পাওয়া যায় তার জন্য ম্যাককের স্কীমে বানানো শুরু হল টালার আকাশ জলাধার। পরিমিত মানে দু তিন তলা পর্যন্ত কল খুললেই জল। রাস্তার লেভেল থেকে বুস্টার পাম্প দিয়ে জল তোলার বালাই সে যুগে ছিল না। ১৯ অক্টোবর ১৯০৯ টালার উঁচু জলাধার বানানো শুরু হল, ১৯১১ সালের ১২ জানুয়ারি কাজ শেষ এবং ১৬ মে জল ছাড়া হল। মোট খরচ তখনকার হিসাবে সাড়ে ২৩ লাখ টাকা। আকাশ জলাধারের ভাইটাল স্ট্যাটিস্‌টিক্স হল ১৬ ফিট গভীর, ৩২১ ফিট দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে এবং জলধারণের ক্ষমতা ৯ মিলিয়ন গ্যালন। ট্যাংকটি মাটি থেকে ৪৪০ ফিট উঁচুতে ইস্পাতের থামের উপর দাঁড়িয়ে এবং চারটি কুঠুরিতে ভাগ করা যাতে যে কোনটি আলাদা করে নিয়ে সারাই বা সাফাইয়ের কাজ করা যায়।

চাপা কল ও টেপা কল

এতেও কিন্তু উঁচু প্রেসারে নিয়মিত সরবরাহ পাওয়া গেল না। তাই ১৯২৩ সালে পলতা টালা মিলিয়ে আর একটি বিরাট পরিকল্পনা নেওয়া হল মুর ও বেটম্যানের রিপোর্ট অনুযায়ী ২,৬৩,৬০,৩৪০ টাকায় দৈনিক ৮৩·৫ মিলিয়ন গ্যালন জল সরবরাহের জন্য। এতে করে ৬০ ইঞ্চি মেইন, চাপ ও সরবরাহ রক্ষার মেইন ও মহল্লা অনুযায়ী রিজার্ভ জলাশয় তৈরী করা হল। এই স্কীম নেওয়া হয়েছিল বলেই মহাযুদ্ধ ও দেশভাগের দরুন হঠাৎ বাড়তি লোকের চাপে কলকাতার জলব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েনি। যুদ্ধের দরুন আর একটা জিনিষ হয়েছিল। এ আর পী ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে অনেক টিউবওয়েল বা চাপা কল বসিয়েছিল আকাশ আক্রমণ প্রতিরক্ষার অঙ্গ হিসাবে। যুদ্ধের পর সেগুলির রক্ষণাবেক্ষণ কর্পোরেশনে বর্তাল। সেই থেকে আমাদের ছোট টিউবওয়েল বিভাগের জন্ম, যার সংখ্যা আজ সাড়ে পাঁচ হাজারে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে বড় বেড়ের টিউবওয়েল বসান শুরু হল, তার সংখ্যা আজ ২০০-র উপরে। ১৯৭৫-৭৬ সালে পলতা থেকে জলের হিসেব আগেই দিয়েছি। ১৯৭৪ সালে ওখান থেকে দৈনিক জল পাওয়া যেত ১১০ মিলিয়ন গ্যালন ও টিউবওয়েল থেকে ৩০ মিলিয়ন গ্যালন। সেই হিসেবটি নীচে দিলাম :

পলতার ৭৩টি স্লো স্যাণ্ড ফিলটার থেকে	৩৮
পুরোণ স্টেশনের র‍্যাপিড গ্র্যাভিটি থেকে	১৮
নূতন স্টেশনের র‍্যাপিড গ্র্যাভিটি থেকে	৫৪
মোট	১১০

তৎসহ টিউবওয়েল থেকে

১৯০টি বড় বেড়ের টিউবওয়েল	২৫
৫০০০টি হাতে চাপা কল	৫
সর্বমোট দৈনিক সরবরাহ মিলিয়ন গ্যালনে	১৪০

কলকাতার জলসরবরাহব্যবস্থা ছিল প্রথমে ভবানীপুর পর্যন্ত, পরে বালিগঞ্জ এলাকায় প্রসারিত করা হয়। টালার জল এত দূরে যথেষ্ট হবে না বলে বড় টিউবওয়েলের জল সোজাসুজি মেইনে ঢোকানো বা ইনজেক্ট

করার বন্দোবস্ত হল। মাণিকতলা ১৯২৩ সালে কলকাতা কার্পোরেশনের আওতায় এল, টালিগঞ্জ ১ এপ্রিল ১৯৫৩তে। এই দুই প্রত্যন্ত প্রদেশে নলের জলের কোন আয়োজন ছিল না। পুকুর, ডোবা ও কিছু প্রাইভেট অগভীর নলকূপ বা হাতে চাপা কলই সম্বল। দ্রুত কলোনি ও বাড়ীঘর গড়বার ফলে পুকুরগুলি বোজানো শুরু হল। তাছাড়াও স্বচ্ছ নির্দোষ জল দেবার জন্য বড় নলকূপ বসানো ছাড়া উপায় নেই। কর্পোরেশন ও সি আই টি শুরু করল, পরে সি এম ডি এ'র হাতেই বেশী কাজ। টিউবওয়েলের জল পাইপ দিয়ে চালানোর একটা অসুবিধা এই যে লোহাজাতীয় আস্তরণ পরে জলচলাচলের পথ বুজিয়ে আনে, যেমন কোলেস্টেরলের আধিক্যে ধমনী ও শিরা রুদ্ধ হয়ে আনে ব্লাড প্রেশার ও থ্রম্বসিস। তাছাড়া ফেরুলের পিতলের সঙ্গে টিউবওয়েলের লোহা মিলে বাইমেটালিক করোশন বা দ্বিধাতব ক্ষয় ডেকে আনে অর্থাৎ মরচের আধিক্য।

এই থেকে জলসরবরাহ অব্যাহত রাখার অন্তরায়গুলির একটা ধারণা হবে। প্রথমতঃ টিউবওয়েল একটা সাময়িক সমাধান। তারপর জলতল নেবে যাওয়ার দরুন পাইপে চলাচল রুদ্ধ হওয়ায় এবং টিউবওয়েলের ডগায় বালির আক্রমণে মাণিকতলা, টালিগঞ্জ তথা টিউবওয়েল নির্ভর এলাকায় ঝঞ্ঝাট লেগে থাকবেই। আজকাল আবার স্লটেড বা ছেঁদা পাইপের ছাকনির ব্যবহার বেশী। তার জন্য মিহি বালি ঢুকে জলকে ঘোলাটে করে দেয় ও টিউব ওয়েলের আয়ু কমিয়ে আনে।

টালা-পলতার সংস্কার

পলতায় ১৯৭০ সালে র‍্যাপিড গ্র্যাভিটি ফিলটার বাবদ বাড়তি ৬০ মিলিয়ন গ্যালন ক্যাপাসিটি পেলেও উৎপাদন সে অনুপাতে বাড়ল না। কেননা স্লো স্যাণ্ড ফিলটারের অনেকগুলি বুজে এসেছে, জলশোধনের কাজ স্তিমিত। আমরা ১৯৭৪এর গোড়ায় ১৭টা বেড সংস্কার করেছি। তারপর সি এম ডি এ'র হাতে কাজটা গেল, খুবই ঢিমে তালে কাজ চলছিল, ১৯৭৫এর গ্রীষ্ম পর্যন্ত মাত্র তিনটা সংস্কার হয়ে ফেরত এসেছিল। স্লো স্যাণ্ড ফিলটারের কার্যক্ষমতা অনেকাংশে নির্ভর করে সেডিমেন্টেশন বেসিনে ঘোলা জল কতটা থিতোয় এবং উপর উপর চেলে বা চুইয়ে কতটা আধা পরিষ্কার জল এল তার উপরে। সেডিমেন্টেশন বা পলি থিতানোর পুকুর

পরিষ্কার করবার জন্য কর্পোরেশন হাতে মাটি কাটা ও হাইড্রলিক ডেজিং পদ্ধতি—পাঁক তোলার দু রকম পরিকল্পনাই করেছিল।

সেই সময় সি এম ডি এ, ভারত সরকার, টালা ও পলতা সংস্কারে বড় রকমে এগিয়ে এল। সি এম ডি এ চীফ এনজিনিয়ার পর্যায়ের একজন সিনিয়র ডাইরেক্টরকে আবাসিক ভাবে নিযুক্ত করলেন। তাঁকে আমরা পুরসভা থেকে স্পেশাল ডেপুটি কমিশনারের পদমর্যাদা দিয়ে ওখানে আমাদের কাজেরও সব ভার দিয়ে দিলাম ১৯৭৫ সাল থেকে। এই পুরো কাজ এখন এই যৌথ ব্যবস্থায় দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। সংস্কারের কাজ এগিয়ে গেলে ক্ল্যারিফ্লকুলেটরের জল থিতানোর পুকুরে সরাসরি নিয়ে আসা হবে। তাতে প্রাক্ থিতানোর পুকুর বা প্রিসেটলিং ট্যাংকগুলি খালি হয়ে যাবে। সেগুলির জল ছেঁচে ফেলে মাটি কাটা হবে। প্রাক্ থিতানোর পুকুর সংস্কার হলে স্লো স্যাণ্ড ফিলটারে সেখান থেকে জল নেওয়া যাবে, ক্ল্যারিফ্লকুলেটর থেকে নেওয়ার দরকার পড়বে না। তখন বিশ্ব সংস্থার মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী ১০০ মিলিয়ন গ্যালনের ক্ল্যারিফ্লকুলেটরগুলি বৃহত্তর কলকাতার সব মিউনিসিপ্যালিটিতে জল জোগানের কাজে লাগানো যাবে। আমাদেরও লাভ হবে, কেননা ক্ল্যারিফ্লকুলেটরের খোরাক বছরে ৫০ লাখ টাকার ফটকিরি।

পলি থিতানো ও উপর থেকে পরিষ্কৃত জল ঢালাই জলশোধনের আদি ও অকৃত্রিম পন্থা। আজ এটিকে স্তিমিত ও দুর্বল মনে হতে পারে, অধিক পরিমাণে জায়গা ও মানুষ লাগে বলে। কিন্তু এই পদ্ধতিতে যান্ত্রিক গোলযোগে বিপর্যয়, বিদ্যুৎ ব্যবহার ও মালমশলার খরচ অনেক কম। আমরা ধর্মে বিশ্বাস করি, যত মত তত পথ, রাজনীতিতে সহাবস্থান। কাজেই কারিগরি ও কর্মধারায় পুরাতন প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর সর্বাধুনিক সফিস্টিকেটেড পদ্ধতির সমন্বয়। মোদ্দা কথা, ক্ল্যারিফ্লকুলেটরের তড়িঘড়ি আয়োজন হয়েছে বলে সেডিমেন্টেশন ও ডিকামেন্টেশনের কুলুকুলু আজ অচল হয়ে গেছে বলে কয়েক বছর আগেও যে ধারণা ছিল সেটা ভুলতে হবে।

পলতা থেকে টালায় জল পাঠানোতেও বটলনেক আছে। যেমন পলতার পুরাতন ও নূতন সিস্টেমের মধ্যে সামঞ্জস্য বা ফ্লেক্সিবিলিটির অভাব এবং টালায় মান্ধাতার আমলের স্টীম পাম্পে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলা ও তৃতীয়

পাম্পিং স্টেশন বসানোতে দেরি। এই কাজগুলি সি এম ডি এ এখন এক হাতে নিয়েছে এবং ইতিমধ্যেই অনেকখানি এগিয়ে গেছে। এই সাথে পলতা ও টালায় মিটার সারানো ও বসানোর কাজ করা হচ্ছে যাতে করে কতটা জল ছাড়া হল তার সঠিক হিসেব মেলে। সেই সঙ্গে শতচ্ছিদ্র মেইন ও পাইপের পরীক্ষা হাতে নেওয়া হচ্ছে নাগপুরের ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্টাল এনজিনিয়ারিং ইনস্টিট্যুটের সহায়তায়। লীক ও অপচয় কতটা হচ্ছে তার সঠিক হিসাব চাই। মোটা কথায় আমরা বলি সবচেয়ে খারাপ এলাকা কাশীপুর, যেখানে রাস্তার নল বা টেপা কল থেকে শতকরা ৪০ ভাগ জল অপচয় হয়। কিন্তু কোথায় কান্নার মত ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরে আর কোথায় দুকূলভাসী প্লাবন তার হিসাবে বসতে আর দেরি নয়।

জীবনজল ও অন্তর্জলি

গত দু বছর ধরে নানান সাময়িক অসুবিধা সত্ত্বেও আমরা পলতা ও টিউবওয়েল মিলিয়ে প্রতি বছর জলের জোগান বাড়িয়ে যাচ্ছি—শতকরা ১০ ভাগের চেয়ে বেশী হারে। জলের জন্য আমাদের অফিসার বা উঁচু পর্যায়ের সুপারভাইজারের সংখ্যা ছিল নগণ্য। সমস্ত জলবিভাগের জন্য আবহমান কাল ধরে আমাদের একজনই উঁচু অফিসার ছিলেন, নাম একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার, ওয়াটার ওয়ার্কস। ১৯৭৫-এর গোড়ায় কেবল পলতা-টালায় একজন একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত করা হয়েছিল। তারপর সি এম ডি এ'র তরফে চীফ ইঞ্জিনীয়ার পর্যায়ের অফিসার যার কথা আগেই বলেছি। এখন পুরোন ইঞ্জিনীয়ার যার নাম একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার ওয়াটার সাপ্লাই, তিনি দেখেন শহর সরবরাহের কাজ, টালা থেকে বিভিন্ন এলাকায় পাইপের কানেকশন, টিউবওয়েল বসানো, সারানো ও সরবরাহ, লরি দিয়ে জলসেবা, জাহাজে জল বোঝাই ইত্যাদি।

পলতার ৯০০ একর জমি মহামূল্য। কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতায় জল দান করতে সেখানে আছে শতাব্দীর কাজ। ফরাক্কা মারফত তাজা জলের আমদানি বাড়ানো যতটা কলকাতা বন্দরের প্রয়োজন, ততটা কিংবা তারও বেশী প্রয়োজন তাবৎ এলাকার তৃষ্ণা মেটাতে। সেই তৃষ্ণা পলতাকে বাড়িয়ে এবং দক্ষিণ কলকাতায় গার্ডেন রীচ প্রকল্পকে ত্বরান্বিত করে। গভীর বা অগভীর নলকূপ বসিয়ে কখনই নয়। কলকাতাবাসীর এই

কথাটা মনে রাখা ও কাজে লাগানো দরকার। তাহলেই স্পষ্ট হবে জলের অপর নাম কেন জীবন এবং মরণেও মুমূর্ষুর মঙ্গলে কেন চাই পবিত্র বা গঙ্গাজল অন্তর্জলি প্রক্রিয়ার জন্য।

গঙ্গার পূজা গঙ্গাজল ছাড়া হয় না। তাই জলছবি আঁকতে জলের প্রশস্তি দিয়েই শেষ করি। জল খুবই সাধারণ আবার অসাধারণ বস্তু। জলই একমাত্র জিনিষ যেটি প্রকৃতিতে কঠিন তরল ও বাষ্প এই তিন রূপে পাওয়া যায়। ছোটবেলার ভূগোলে পড়ি পৃথিবীর উপরিভাগে তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল, শরীরবিজ্ঞানে পড়ি মনুষ্যশরীরের রাসায়নিক গঠনে শতকরা ৯০ ভাগ জল। জলের দ্রবণক্ষমতা ও সারফেস-টেনশন সমস্ত তরল পদার্থের চাইতে বেশী, যেমন বেশী বাষ্পীকরণের তাপ। ৪ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব সব চেয়ে বেশী। তাই শূন্য ডিগ্রীতে বরফ জমে ভেসে ওঠে, অন্যান্য তরল পদার্থ জমলে তলিয়ে গিয়ে নীচে বাসা বাঁধে। জলের এই সব অলৌকিক গুণের জন্যই পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি হয়েছে, জল দিয়ে আমরা জীবন ও বিজ্ঞানের হাজারো প্রয়োজন মেটাচ্ছি। তাই জলের ব্যবহার ও ম্যানেজমেন্টে আমাদের সতর্ক ও শ্রদ্ধাশীল হতে হবে যাতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পারি।

কবিতাগুচ্ছ

শামশের আনোয়ারের কবিতা

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়

বেশ কয়েক বছর আগে পাবলিক বাসে সিউড়ী থেকে বহরমপুর যাবার পথে সাঁইথিয়া হাটে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়েছিলো আমার। কাঠের রসকষহীন পাল্লা তুলে খুব ভোরে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শীতকাতর আমি লক্ষ্য করি বেচাকেনার জমজমাট পৃথিবী, পসরা নিয়ে দূর দূর গ্রাম থেকে এসেছে মানুষ ও মেয়েমানুষ, পণ্য হিসেবে প্রস্তুত হয়ে আছে সাদা হলুদ ফুলকফির পাশে লাল গাজর, বীট ও টম্যাটো। এবং আরো অনেক কিছু। এরই পাশে ময়লা চাদর জড়ানো একটি লোক, কোনো যাদুঘর থেকে উঠে আসা পূর্ণাবয়ব ব্রঞ্জ মূর্তি যেন, ছোট একটি ঝুড়ি নিয়ে নিরানন্দ মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁর চোখের সঙ্গে আমার ভাষা বিনিময় হয়ে যায় মুহূর্তেই, আমি আর হাঁটু মুড়ে বসে থাকতে পারিনা, বেরিয়ে পড়ি বাইরে, নিছক কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই জানতে চাই লোকটির প্রাসঙ্গিকতা। সে এনেছে কিছু ডিম এবং বেশ সন্তর্পণেই ; যাতে সেগুলি ভেঙে না যায় তার জন্য ছিলো খড়, খড়ের কোলে ডিমগুলি বসানো। একতলার উপর দোতলা, বা এরকম আরো কয়েক তলা খড়ের আসনে যে সব হাঁস আমি কখনোই চোখে দেখবো না তাদের ডিম। ছোট নাকি মাঝারি একটি ঝুড়ির মধ্যে এত কিছু আয়োজন! কিন্তু বিস্ময় ছিলো অন্যত্র। আয়তনে এত বড় ডিম যে মনে হয়েছিলো ওগুলি রাজহাঁসের। কিংবা হয়ত পোলট্রির ডিম যার আকার সাধারণ হাঁস মুরগির ডিমের চেয়ে সর্বদাই বড়। ডিমগুলি হাতে ছুঁয়ে

দেখার জন্যে এক অদম্য আকর্ষণ অনুভব করি এবং একটি ডিম হাতে নিয়ে অনিবার্যভাবে দ্বিতীয়বার আমি চমকে উঠি। ডিপ ফ্রীজ থেকে তুলে আনা ডিম যেন আমার হাতের মুঠোয়! কোল্ড ষ্টোরেজের ডিম? এরপর আমাকে জিজ্ঞেস করতেই হয়। লোকটি আবার যাদুঘরে ফিরে যায় এবং ধুলো-মাখা কাচের আলমারির ভিতর থেকে জানায়—শেষ রাতে ঘুম থেকে উঠে সে ডিমগুলি নিয়ে আসছে সাত মাইল দূরের ভালকুঠি গ্রাম থেকে। শুকতারার নিচে, পৌষের শীত ও শিশিরে ওরা পেয়েছে এক বিশাল ফ্রিজের ড্রয়ার! আমি নিরুপায়।

এবং খড়ের ভিতরে শীতের সাপের মতো আশ্রিত ডিম, যা তুলনা-মূলকভাবে কিছুটা উষ্ণ, আমি খুঁজে পাই সেই ঝুড়ির ভিতর সন্ত্রাসবাদী দুটি হাত চালিয়ে। ডিমের ভিতর থেকে হাতে উঠে আসে পাখির প্রাণ-স্পন্দন। আমি সম্ভবত ডিমের ভিতরে ডানার পালক পর্যন্ত ছুঁতে পেরেছিলাম সেদিন সেই শীতের সকালে। গোটা ব্যাপারটাই ছিলো অপ্রত্যাশিত!

বয়স তারপর কতটুকু বেড়েছে জানিনা, কিন্তু চোখের সামনে বদলে যেতে দেখলাম অনেক কিছু। গ্রাম এবং শহরের মধ্যে চলাফেরার সময় আবার এরকমই এক অভিজ্ঞতা হয়েছিল শামশেরের 'মা কিংবা প্রেমিকা' বইটি হাতে নিয়ে, বীরভূমের হাটের সেই অসাধারণ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলাম আবার। সাধারণ, নিরামিষ চেহারার কবিতার বই যে ধারণ করতে পারে কী বিপুল প্রাণের আগুন, এবং সম্পূর্ণ নতুন চিত্রকল্প সাজিয়ে বক্তব্যে ও ভঙ্গিতে তা যে অনুরূপ অন্যান্য বইয়ের তুলনায় হতে পারে কতটা স্বতন্ত্র, শামশেরের এই বইটির ভিতরে প্রবেশ না করলে সে বিষয়ে কারো পক্ষে যথার্থ কোনো ধারণা করা সম্ভব হবে না। সেই পাঠকদের বুদ্ধি ও রুচিকে আমি প্রশংসা করি যাঁরা দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত অজস্র বাজে কবিতার ভিড়ে হারিয়ে না গিয়ে শামশেরের কবিতার মৌলিক চেহারা-টিকে আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে সনাক্ত করতে পেরেছেন, এবং শুধু সনাক্ত করেই তাঁদের কাজ ফুরিয়ে যায়নি, সমকালীন সমস্ত কবিতা থেকে শামশেরের কবিতার ব্যবধানের দূরত্বটুকু পরিমাপ করতে সক্ষম হয়েছেন।

২

জীবন এবং ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যে কবিতার কোনো বিরোধ নেই, বরং তারা অঙ্গাঙ্গী জড়িত, বা সৎ কবিতা জীবন ও ব্যক্তিত্বনির্ভর, নতুবা সে ফুরফুরে

সাদা কাগজের ফুল এরকম মনে হতে পারে। শামশের আনোয়ার গদ্যে আত্মজীবনী রচনা না করে কবিতার আশ্রয় নিয়েছেন, বলিনা। তাঁর ক্ষেত্রে কবিতার মৌল ভাষা জীবনের অকৃত্রিম ভাষার রূপ পরিগ্রহণ করেছে। এমন এক দুর্লভ সুকঠিন রচনাকার্যে তিনি ব্যাপৃত, যার জন্যে তাঁকে জীবনের অনেকখানি সুসময় দরাজ হাতে খরচ করতে হয়। অনুরূপ উদাহরণ বেশ বিরল, অন্তত আমাদের এই জলাভূমির দেশে। ইতিমধ্যে আমাদের কষ্টার্জিত অভিজ্ঞতায় একথা মুদ্রিত হয়েছে যে আত্মচরিতই কবিতা নয়, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত —এই দুই পরস্পরসম্পৃক্ত উপাদান কোন্ কবি কতখানি কাজে লাগান তার উপরেই নির্ভর করে গড়ে ওঠে কবিচরিত্র ও প্রাসঙ্গিক জটিল বিষয়াবলী। তিক্ত সত্য এই যে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অন্যতম সর্ত নিষ্ঠুরতা। আত্মগ্রাসী ক্ষুধা নিজের প্রতি বিষণ্ণতা। কবিকে তাই আত্মভুক হতে হয়। দশমহাবিদ্যার ছিন্নমস্তা। নিজের রক্ত পান করতে হয় নিজেকেই। প্রতীকী অর্থে। যা করেছেন শামশের। নিজেরই কবিতায়। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের রক্ত-মেদ-মাংস-মজ্জা বিশ্লেষণ করে আমরা এ তথ্য জানতে পারি।

প্রথমদিকের কবিতার উপজীব্য ছিলো ক্লান্তি ও অতৃপ্তি। কবি নিজের কাছে ফিরে এসে নিজেকে অবলম্বন করেন। দ্বিতীয় কোনো লোক না থাকায় নিজেকে লক্ষ্য করেই আমার সমস্ত শাসন, আঘাত, অভিমান ও ভালোবাসা—এ-পংক্তির অনুধাবনীয় সত্য এই যে আত্মপ্রেমের বিপন্ন, নিবিড় পর্ব কবি অতিক্রম করবেন। আমরা নিঃসঙ্গতার ঘোষণাপত্র বাতিল করে কবিকে মা কিংবা প্রেয়সীর কাছে ফিরে আসার অন্তর্লীন ইচ্ছা প্রকাশ করতে দেখেছিলাম। কিন্তু নারীর কাছে কোনো প্রত্যাশাই বোধহয় পূরণ হয় না। অতৃপ্ত, আঘাতে অভিমানে, রক্তাক্ত মানুষ নারীর কাছে যা চায়, পায় না। সে কখনোই হতে পারে না তার আত্মার সঙ্গী, নিঃসঙ্গতা মোচনের সহচর, প্রাণের সহযাত্রী। নিষ্ফল মানুষ হিসেবে কবি আবার ফিরে এলেন নিজের কাছে। মনে পড়ে তিনি লিখেছিলেন,—নিজেরই বাঁধ ভাঙা, ঘোলাটে নদীর জলে/ভাসিয়ে দিই ছোট ছোট কাগজের/নৌকো—যা আমার কবিতা!···আমার ব্যর্থ শরীরটি হাজার হাজার টুকরো/হয়ে মিশে যায় আমারই লেখা উড়ন্ত,/ছন্নছাড়া কবিতাগুলোর সাথে। অস্তিত্ব ও কবিতা এখানে একাকার হয়ে যায়। কবি নিজেকে দখল করেন। নিজেকে নিয়ে থাকতে চান সঙ্গত কারণেই। নিজেকে উপলক্ষ্য করে তিনি

লেখেন—কেননা তুমি ছাড়া আর কেউই নেই এ পৃথিবীতে/যে কিনা নিঃসঙ্গ পতাকার নিচে ও-রকম গর্বের/বিউগিল বাজাতে পারে। প্রাথমিক পর্বে অতি স্পষ্ট করে সব কিছু বলা বা ঘোষণা করাই ছিলো কবির বৈশিষ্ট্য। ইঙ্গিতাশ্রয়ী না হয়েও তাঁর রচনা যে কবিতা হতে পেরেছে তার কারণ বোধ করি এই যে আপাত কবিত্বহীন ও কবিত্বময়—এ দুই উপাদান তাঁর মধ্যে সার্থকভাবে মিশেছে। সমকালীন বাংলা কবিতায় আর কোনো কবিই এতখানি প্রত্যক্ষভাবে নিজেকে হাজির করেন নি। কোনো নাটকীয়তা নেই তাঁর মধ্যে, নেই সস্তায় বাজিমাতের প্রবণতা থেকে উৎপন্ন ছদ্ম আত্মজীবনী রচনার প্রবল আগ্রহ। তাঁর স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতা বোঝা যায় তাঁর কবিতা থেকে। এখানেই শামশেরের কবিতা আর সকলের রচনার চেয়ে বেশ অন্য ধরনের। নিজে তিনি স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত একটি ধারার সূচনা করেছেন বলতে চাই। এখনো পর্যন্ত সে-পথে তিনি একক পথিক। এবং জানি পরবর্তী বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর অনুসারী কবির সন্ধানলাভ খুব সহজসাধ্য হবে না।

শামশেরের প্রথমদিকের কবিতায় ছিলো বেশ কিছু অসুখের চিত্রকল্প। অসুখের চেয়েও বোধহয় বেশী ছিলো আত্মক্ষুধার অনুষঙ্গ। 'বর্ষা' কবিতায় কবি লিখেছেন—নিজেকে আহার করো—এসো/পান করো নিজের সমস্ত অনুতাপ ও গর্জন-মুখর বৃষ্টির ধারা; /···প্রবল কুপিত মারে খুলে যায় ভিতরের ছাতা। এর আগের কবিতা 'সমকাম'-এ আছে—নিজের কোমর জড়িয়ে ধ'রে, নিজেরই তরুণ বুকে মুখ গুঁজে/শুয়ে থাকতে চাই। প্রসঙ্গত গুন্নার মিরডালের একটি অসাধারণ উক্তি ঝাপসা স্মৃতিতে ভেসে ওঠে —**When the trough is empty horses will bite each other.** এই উক্তির আইরনি মেনে নিয়ে বলি—ঘোড়া না হয় নিজেকে খাবে, কিন্তু উপায়হীন, একাকী ক্ষুধার্ত মানুষ কি করবে? নিজেই নিজেকে খাবে? (তিরিশের যুগে সুধীন্দ্রনাথের অমোঘ 'উটপাখি' কবিতায় এই প্রশ্নই উচ্চারিত হয়েছিলো।) মানুষ কি নার্সিসাস সুলভ আত্মপ্রেম ও ক্ষুধার হাতে সমর্পণ করবে নিজেকে? শামশেরের কবিতার পৌনঃপুনিক বিষয়বস্তু ছিলো এই ক্ষুধা। কিন্তু তীব্র আত্মপ্রেম ও ক্ষুধাই তো শুধু আত্মচরিতের উপাদান নয়। নারী ও অসুখের ছবি বারবার ঘুরে ঘুরে এসেছে যুবককবির জীবনে।

স্বাতন্ত্র্যের বোধ ও তীব্র ব্যক্তিত্ব শামশেরের কবিতায় নিজস্ব চিত্রকল্পের জন্ম দিয়েছে। এর জন্যে দায়ী সামাজিক কার্যকারণ। আইসোলেশন যে সব ক্ষেত্রেই হতাশায় পরিণত হয় তা নয়, মানুষ বিচ্ছিন্নতার শিকার না হয়ে নিজের ব্যক্তিত্ব গড়ে নেবার যথেষ্ট সুযোগ পায়। ব্যক্তিত্ব থেকে আসে মৌলিক চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গি যার প্রকাশ দেখি শামশেরের কবিতায়। যেমন, বিশাল ব্যাতর ব্যাং ফুলে ওঠে হৃৎপিণ্ড জুড়ে, কিংবা,—আঁধার গির্জার মতো ব'সে কি-রকম নক্ষত্রের কথা চিন্তা করো, ইত্যাদি। এইসব চিত্রকল্পের সঙ্গে প্রচলিত কোনো চিত্রকল্পের সামান্যতমও মিল নেই। কবির পরাবস্তু চেতনাও জীবনানন্দীয় নয়, বরং তা ডালির রচনাকর্মের সঙ্গে তুলনীয় :

> জিভ বারান্দায় ঝোলানো তারে টাঙানো হয় ; একটা ছোট্ট ক্লিপ
> আটকে দি ওপরে। চোখ দুটো আমি আর বহন করতে পারি না,
> বোতলের স্পিরিটের ভিতর ডুবিয়ে রাখি।

বাংলা কবিতায় এই বিমূর্তকল্পনা খুব বেশী দিনের পুরনো নয়। এগুলির বিষয়ে পাঠক এখনো নিজেকে প্রস্তুত করার সময় পান নি। দেরি হলেও আমি জানি শামশেরের কবিতা একদিন বৃহত্তর পাঠক সমাজের কাছে প্রিয়তর ও অনিবার্যভাবে গ্রহণীয় হয়ে উঠবে।

৩

উপমাই কবিত্ব—জীবনানন্দের এই প্রবাদতুল্য মিতকথনকে একটু ঘুরিয়ে, অন্যভাবে বলি চিত্রকল্পই কবিত্ব। সামগ্রিক অর্থে একমাত্র তাকেই কবিত্ব বলতে হয়ত অনেকেই কুণ্ঠিত হবেন। কিন্তু কবিত্বের প্রধান অবলম্বন ও উপাদানই যে চিত্রকল্প এ বিষয়ে কারো সন্দেহ থাকে না অবশ্যই। বিশিষ্ট চিত্রকল্পের সমাবেশ শামশেরের কবিতাকে করে তুলেছে অসাধারণ। এই সংকলনে গৃহীত ওঁর সাম্প্রতিক কবিতাগুলি এই উক্তির সপক্ষে সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু শুধু চিত্রকল্পে দৃষ্টি সীমাবদ্ধ হলে শামশেরের সাম্প্রতিক কবিতার বিবর্তন ও তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিষয়ে আমরা সম্যক্ অবহিত হতে পারবো না। 'বর্ষা' কবিতার বহু আগে যিনি লিখেছিলেন—কেন চাওয়া বহির্বৃষ্টি/অন্তর্বৃষ্টি ভরে দিলো যত দৃশ্যপট;—তিনিই এখন লেখেন—

> আণবিক ছাই, কাচ ও তেজস্ক্রিয় হাহাকার নিয়ে বৃষ্টি ঝরছে।
> পৃথিবীর সব ঘড়ি গিলে ফেলে বৃষ্টি ঝরছে এখন।

> কালো টায়ারের বৃষ্টি, ঘুমিয়ে পড়া ও ঘুম না হওয়া, অম্বল ও
> ধাতু দৌর্বল্যের
> বৃষ্টি, যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা ও ছুরিতে শান দেওয়ার বৃষ্টি ঝরছে ফুটপাথে।

সোস্যাল রিয়ালিটি বা বাস্তব অবস্থার তির্যক রেফারেন্স বদলে গিয়ে এবার কবিতার দৃশ্যপট হচ্ছে পরিবর্তিত, ঘটছে জাগতিক সত্যের সমকোণিক উদ্ঘাটন। ব্যক্তি থেকে কবি যাচ্ছেন সোসাইটি ও কমিউনিটির দিকে। এই সিরিজের কবিতায় 'আমি'র চেয়ে প্রাধান্য পেয়েছে 'আমরা'। যেমন,

> ঠিক আছে আমাদের চাবুক মারামারি, গণ্ডগোল / ও বিকসুল
> খাওয়া। / ঠিক আছে আমাদের প্রতিজ্ঞা সব।
>
> (শনিবারের কবিতা)

'শনিবারের কবিতার' উৎস ভয় এবং এক ধরনের ব্যঙ্গ ও ঘৃণা যার ক্লাইমাক্স 'দাঁত' রচনাটি :

> আমরা চিবই দাঁত এবং রক্ত
> আর মানুষ যখন নিজের দাঁত নিজেই চিবতে থাকে
> হতভাগ্য মানুষ তখন নিজেরই ঘাড়ের ওপর কয়েকটি
> রক্তমাখা, উপড়ান দাঁত গাঁথা রয়েছে টের পায়।

বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে কবি জেনে ফেলেন সমকালীন জীবনের ট্র্যাজিক ডেস্টিনির কথা। আশু সর্বনাশ ও নেপথ্যে ষড়যন্ত্রের কথা। 'মুখ' কবিতায় যখন লেখা হয়—মুখের ওপর হঠাৎ ঝাঁপ দেয় আর একটি মুখ। ধারাল / নখ দিয়ে সে আমাকে ছিঁড়তে থাকে, কিংবা 'শাসন'-এ—

> সমস্ত প্রতিভা গুঁড়ো করে বেজে চলেছে রেকর্ড
> আমাদের শার্টের হাতা, জুতো, রতিক্রিয়া ও চশমার
> কাঁচ থেকে
> সারাক্ষণ ছড়িয়ে পড়ছে খড়্গ, চাবুক এবং খড়্গ
> ও চাবুকের হিংস্র দ্যুতি—

বুঝতে দেরি হয়না সর্বনাশ ও গভীর ষড়যন্ত্রের বিষয়টিই কবি গভীর তুলিতে এঁকে রাখেন আমাদের জন্যে!

এতগুলি কবিতা যে উপন্যাস বা গল্পের মতো প্রথম পংক্তি থেকে সুরু করে শেষ পংক্তি পর্যন্ত পড়ে যেতে হবে তা নয়। বরং খুবই স্বাভাবিক যে বিচ্ছিন্নভাবে, বিভিন্ন সময়ে বা হয়ত একই সময়ে ওলট পালট করে, এগিয়ে

পিছিয়ে, পিছিয়ে এগিয়ে কবিতাগুলি আমরা পড়ব। এই প্রসঙ্গে আমার ধারণা, কেউ যদি 'অবিশ্বাস' ও 'অতিমানব' কবিতা দুটি পিঠোপিঠি পড়েন, তাদের নতুন এক তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করবেন—

পাঁচড়া ও খুশকি ছেয়ে ফেলেছে আমাদের সমস্ত জীবন
আমরা পাঁচড়া ও খুশকি নিয়ে ঘুমতে যাই···

(অবিশ্বাস)

পৃথিবীর চর্মের উপর চর্মরোগ মানুষ—সম্ভবত নীৎসের এই উক্তি কি কারো মনে পড়বে শামশেরের 'অবিশ্বাস' পড়ে? এক ধরনের দগ্‌দগে বাস্তবের প্রতি কি কবি রিপালশন্ তৈরী করতে চান না আমাদের মনে? সেইজন্যেই কি 'অতিমানবের' ধ্যানধারণা? নীৎসের **Superman** বলে অন্তত তাকে আমরা কখনোই ভুল করব না। এই অতিমানব আসলে সাধারণ, দুঃখী মানুষ; 'ঘুষখোর পৃথিবীর' ওপর দিয়ে হেঁটে যাবার সময় সে দেখে—

চোখে যেন কিসের রক্ত লেগে আছে
আমি জানি আমার নিঃশ্বাসেও লেগে আছে রক্তের ছাপ···
আমার পায়ের এক একটি বিশাল ক্ষেপ কলেজ স্ট্রীট থেকে
হাজরার
মোড় পৌঁছে যাচ্ছে
হাজরার থেকে আরো বিশাল হয়ে নেতাজী কলোনী
মাটিতে পুরু হয়ে বসে যাচ্ছে অদ্ভুত লম্বা ও চওড়া
এক একটি
রক্তাক্ত দাগ—যা দেখে, আগামী কালের ঐতিহাসিক
পৃষ্ঠার পর
পৃষ্ঠা লিখে যাবেন বিংশ শতাব্দীর অতিমানবের কথা।

শামশের আনোয়ারের নয়টি কবিতা

শাসন

সমস্ত রেকর্ড বেজে চলেছে আমাদের মুখের বিরুদ্ধে
হাত ও নখের বিরুদ্ধে
তীক্ষ্ণ কালো আঁচড়ে বাজছে নষ্ট শরীর, নষ্ট হয়ে যাওয়া মন—
রেকর্ড থেকে লাফ দিয়ে উঠছে খড়্গ ও চাবুক এবং খড়্গ ও
চাবুকের গান
সমস্ত প্রতিভা গুঁড়ো করে বেজে চলেছে রেকর্ড
আমাদের শার্টের হাতা, জুতো, রতিক্রিয়া ও চশমার কাঁচ থেকে
সারাক্ষণ ছড়িয়ে পড়ছে খড়্গ, চাবুক এবং খড়্গ ও চাবুকের হিংস্র দ্যুতি

ডানা

কিছু ডানা
সেই ডানাগুলোর কথা মনে পড়ছে
যা অসহ্য মুড়ে আমি হাঁটতাম
বসে থাকতাম চায়ের দোকানে
মাঝে মাঝেই চমকে দেখে নিতাম ছুঁয়ে : আছে তো
ঠিক জায়গায় গোলাপী আগুন ছড়িয়ে তারা আছে তো
তারপর একদিন আস্তে আস্তে ডানার প্রতিটি গ্রন্থি শুরু করলাম
কেটে ফেলতে
হাতের মুঠোয় গুঁড়িয়ে দিলাম ডানাগুলোর সূক্ষ্ম ও কোমল হাড়
রাত-দুপুরে, বাসে, চায়ের নিলাম কুঠিতে আজ ব্যাকুল হয়ে
নিজেকে ছুঁয়ে দেখি
কোথাও যদি এক টুকরো হাড় পাই
যেখান থেকে লকলকিয়ে ডানাগুলো ছড়িয়ে পড়বে
আগুনের হলকায় পুড়িয়ে দেবে আমাদের পঁচিশ তলার অফিস-ঘর ও
জ্বালিয়ে রাখবে আমাকে·····সারাক্ষণ মৃদু ও প্রচ্ছন্ন আভায়
এক বিষাক্ত স্বর্গে পুড়ে রাখবে

মুখ

মুখের ওপর হঠাৎ ঝাঁপ দেয় আর একটি মুখ
ধারাল নখ দিয়ে সে কেবল আমাকে ছিঁড়তে থাকে
দুরমুজের আরেকটি ভোঁতা ও বিশাল আঘাতে মুখ চ্যাপ্‌টা করে দেয়,
একটি মুখ সহাস্য ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয় মুখের আলো
বছরের পর বছর গম্ভীর হয়ে অন্য একটি বসে থাকে মুখের সামনে
একদিন সন্ধ্যায় আমাকে সে জানিয়ে ছিল তার পেপটিক আলসার আছে
আর একটি আমার মুখের কাছাকাছি এসে হেঁড়ে গলায় জিজ্ঞেস করে : এই ;
"মৌচাকে যাবি আমার সঙ্গে …?"
একটি মুখ হাতের মুঠো উঁচিয়ে বক্তৃতা করে 'এত হাসাহাসি, আড্ডা
মোটেই ঠিক না। আমাদের চাই বার্কসংযম ও প্রচুর কাজ।"
অন্যটি চোখ ঘুরিয়ে হাসতে হাসতে আঙুলের খোঁচা দেয় আমার
মুখে ও বলতে থাকে : 'তুমি এত চুপচাপ কেন, ইয়াং ম্যান… ?"
একটি মুখ হঠাৎ ভালোবাসার পিচ্ছিল বমি ছড়িয়ে দেয়
আর একটি নিষ্ঠুর চিমটি কাটে
যখনই কথা বলি, হেসে উঠি যখনই, সে ক্রুদ্ধ চিমটি কেটে
আমাকে শুধোয় :
'এই, তুমি কি আমার ভায়ের কবিতা পড়েছ! তুমি কি আনন্দবাজার
পড়েছ !"

জুতো

আমাদের প্রত্যেকের বাড়ির ছাদ ও কার্নিস দখল করে ফেলেছে জুতো
দিনরাত বসে আছে রিভলভিং চেয়ারের ঠিক মাঝখানে।
লটপট করে ঝুলে পড়ছে ফিতা
শিথিল হয়ে ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়ছে চেয়ারের দু পাশের হাতলে।
জুতোর ভিতর বেজে উঠছে ড্রামের আওয়াজ, হুইসিল, একটি জুতোর
মধ্যে কুচকাওয়াজ করে হেঁটে যাচ্ছে আরো অনেক লক্ষ জুতো।
আমরা জুতো পুঁতে দিই টবের মাটির ভিতর।

এবং আমাদের স্ত্রীলোকেদের পোষাক খুলে ফেললেই তাদের স্তন,
পেট, উরু, নাভি, ঘাড় এমনকি তাদের হাসি বা চাউনিতেও
অসংখ্য জুতোর ছাপ দেখতে পাওয়া যায়।
আর আমাদের কলম থেকে গলগল করে শুধুই বেরিয়ে আসে পচে যাওয়া,
গলিত, নষ্ট জুতো এবং জুতো।

অনর্গল

সারাক্ষণ আমাদের কিছু একটা চিবতে হয়
চিবতে চিবতে ফোস্কা পড়ে যায় আমাদের গালে
জিভে লাল টকটকে ঘা ছড়িয়ে পড়ে
"জানোয়ার, মিথ্যুক, প্রতারক…" নিজেদের এই বলে সম্বোধন করি
আমরা ও সারাক্ষণ কিছু একটা চিবুই
পাকস্থলীর চেয়ে গুরুপাক, হৃদয়ের চেয়েও অনর্গল একটা কিছু আমরা
রাগ, লোহা, ধুলো এবং ঝড় ; ছোট ছোট অসফল পাথরগুলি চিবই আমরা
কাশতে কাশতে চিবই ভোটের খবর, মোকদ্দমার ফলাফল বা ক্যালেণ্ডারে
ছুটির দিনগুলো
একসময় নড়বড়ে হয়ে ভেঙ্গে যায় আমাদের দাঁত
আমরা চিবুই দাঁত এবং রক্ত
আর মানুষ যখন নিজের দাঁত নিজেই চিবুতে থাকে তার চোয়াল ও
সমস্ত মুখ ভেঙ্গে যায়
হতভাগ্য মানুষ তখন নিজেরই ঘাড়ের ওপর কয়েকটি রক্ত মাখা,
উপড়ান দাঁত গাঁথা রয়েছে টের পায়।

অবিশ্বাস

পাঁচড়া ও খুশকি ছেয়ে ফেলেছে আমাদের সমস্ত জীবন
আমরা পাঁচড়া ও খুশকি নিয়েই ঘুমতে যাই
ঘুম থেকে পাঁচড়া ও খুশকি নিয়েই উঠে পড়ি আবার।
ঘুমের ভিতর হয় আমরা কারুর গায়ের দগদগে ঘা আঙুল দিয়ে খোঁচাই

কিংবা অন্য কেউ আমাদের গায়ের দগদগে ঘা খোঁচায় আঙুল দিয়ে।
ঘুমের ভিতর আমরা একজন বন্ধুকে দেখি আর একজন বন্ধুর গায়ে
পেচ্ছাপ করতে।
অবিশ্বাস! ঘোর, দস্তিল অবিশ্বাস খেয়ে ফেলছে আমাদের—
আমরা অবিশ্বাস করি নিজেদের চোখের পাতা
অবিশ্বাস করি নিজেদের জিভ
আর, সুযোগ পেলেই আমাদের জিভ পেচ্ছাপ করে দেয় চোখের পাতার গায়ে
চোখের পাতা সারিবদ্ধ হয়ে জিভের টুঁটি চেপে ধরে।
আঙুল দৃষ্টি রাখে হাতের ওপর, হাত পাহারা দেয় আঙুলকে।
দুটি হাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকে গুমরে ওঠে কামানের আওয়াজ—
আমার ভালো লাগে এ সমস্ত কিছুই
এত ভালো লাগে যে একসময় হাতের প্রতিটি আঙুল, আঙুলের প্রতিটি নখ
জড়িয়ে ধরে আমি কাঁদতে শুরু করি।

বৃষ্টি

এখন বৃষ্টি ঝরছে
লক্ষ লক্ষ বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম-অসুখের, কানা এবং খোঁজা লোকেদের বৃষ্টি
ঝরছে কলকাতায়……জানালার শার্সিতে।
আণবিক ছাই, কাচ ও তেজস্ক্রিয় হাহাকার নিয়ে বৃষ্টি ঝরছে।
পৃথিবীর সব ঘড়ি গিলে ফেলে বৃষ্টি ঝরছে এখন।
কালো টায়ারের বৃষ্টি, ঘুমিয়ে পড়া ও ঘুম না হওয়া, অম্বল ও ধাতু দৌর্বল্যের
বৃষ্টি, যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা ও ছুরিতে শান দেওয়ার বৃষ্টি ঝরছে ফুটপাথে।
বৃষ্টির জিভ ক্রমাগত লম্বা হয়ে চেটে খাচ্ছে বৃষ্টির ঘা……
ঝরছে নিহত কবুতরের বৃষ্টি কুকুরদের বৃষ্টি পচা কালো হামের ফলন্ত
অসূয়ার বৃষ্টি ; ন্যাতা ছেঁড়া কাগজ সমস্ত কিছু পণ্ড হয়ে যাওয়া
অভিশাপ ও ঝগড়ার বৃষ্টি।
শুধু ঐখানে, প্রখ্যাত ব্যবসায়ীর আঠার তলার ফ্ল্যাটে একজন বিরাট
সাহিত্যিক, তুঁদে অফিসার ও জাঁদরেল সাংবাদিক হুইস্কির গ্লাসে চুমুক
দিয়ে হঠাৎ গদগদ স্বরে বলে উঠছেন 'দেখ দেখ, বৃষ্টি ঝরছে আনন্দের

বৃষ্টি কালিদাসের বৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের বৃষ্টি যেখানে উদ্ভূত ঠিক সেখানেই
মিশে যাওয়ার বৃষ্টি, ধ্রুপদ গানের বৃষ্টি ঝরছে ঐ ঝরছে দেখ কৃষি-মন্ত্রীর বৃষ্টি॥

অতিমানব

আমার দুই হাত শার্টের কাফের চেয়েও লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছে এখন
হাঁটুর নিচ অবধি ছড়িয়ে গেছে
ঘাড় দুটো হয়ে পড়েছে সাংঘাতিক উঁচু
স্বার্থপর, ঘুষখোর পৃথিবীর ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি আমি
চোখে যেন কিসের রক্ত লেগে আছে
আমি জানি আমার নিঃশ্বাসেও লেগে আছে রক্তের ছাপ
আমার পায়ের এক একটি বিশাল ক্ষেপ কলেজ স্ট্রীট থেকে হাজরার
মোড় পৌঁছে যাচ্ছে,
হাজরার থেকে আরো বিশাল হয়ে নেতাজী কলোনী
মাটিতে পুরু হয়ে বসে যাচ্ছে অদ্ভুত লম্বা ও চওড়া এক একটি
রক্তাক্ত দাগ—যা দেখে, আগামী কালের ঐতিহাসিক পৃষ্ঠার পর
পৃষ্ঠা লিখে যাবেন বিংশ শতাব্দীর অতি-মানবদের কথা।

শনিবারের কবিতা

ঠিক আছে তাহলে। ঠিক আছে আমাদের চাবুক মারামারি, গণ্ডগোল ও
বিকোসুল খাওয়া।
ঠিক আছে আমাদের প্রতিজ্ঞা সব। আমরা তো মদ খাই শুধুই
প্রতিজ্ঞার জন্য ;
আগামী কালের প্রতিজ্ঞা।
আগামী কাল মানেই আরো কৌশলী ও নম্র হয়ে যাওয়া ;
আগামী কাল মানেই
ধবধবে আণ্ডারওয়্যার, গেঞ্জি ও কাঁচা রুমাল।
এসবের জন্যই তো আমাদের চাকরি-বাকরি……হপ্তা ফুরলে সস্ত্রীক
একদিন বাইরে খাওয়া।

হাঁা, আগামী কাল যে করেই হোক স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্যের ব্যাপারটা
চুকিয়ে ফেলতে হবে।
এছাড়া প্রায় সমস্তই ঠিক আছে। ট্রামলাইনে দাঁড়িয়ে বাইশ না ছাব্বিশ
এই জটিল সমস্যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া কিংবা সন্ধ্যায় হাজার
হাজার ক্লান্ত পুরুষের চোখে স্ত্রী-লোকেদের বন্ধ্যাত্ব দেখতে পাওয়া।
ঠিক আছে
আমাদের পুনর্মূল্যায়নের দাবী। সমর সুকান্তর পুনর্মূল্যায়ন চায়,
বিরুদ্ধ সংস্কৃতি
চায় আমাদের ; বাড়িতে ফিরে কুঁজো চাকরটাকে মাঝে মধ্যেই পেটান চায়।
যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের হৃদয়েও গজিয়ে উঠছে একটা বিশাল কুঁজ—
হৃদয় হৃদয় আঃ কি সাদামাটা এই হৃদয়! তার চেয়ে···যতক্ষণ অবধি না
হাজার হাজার কুঁজো লোকেদের জমে থাকা, বীভৎস রাগের মুখোমুখি
হচ্ছি আমরা।
যদিও এখন সমস্তই ঠিক। শনিবার দুপুর গড়াতে না গড়াতেই মদ খেয়ে
বেহুঁশ লুটিয়ে পড়া। রবিবারটা ফাতেমার, দু রকম মাছের। সোমবার থেকে
আবার আমাদের শরীরের ঘাম ছুটে যাবে শরীরের চেয়েও আগে। পরস্পরকে
তাড়া করে খেয়ে ফেলতে চাইবে তারা। ছড়িয়ে থাকবে লক্ষ লক্ষ আকীর্ণ
দাঁত।
হাসির পিছনে দাঁতের কামড় ও দাঁতের কামড়ের পিছনে হাসির
তাৎপর্য বুঝেসুঝে
দক্ষ সাপুড়ের মত চলতে হবে আমাদের। কিন্তু আজ বেশ একখানা লম্বা
করে বানাও হে! টল দাও একটা আমাকে! প্রতিজ্ঞা করছি, হাজার
বার প্রতিজ্ঞা করছি যে আগামী কাল থেকেই হয়ে পড়ব আরো কৌশলী,
আরো অনেক নম্র।

বিদেশী সাহিত্য

প্রবাসে পরিহাসে একা ঃ সল বেলো

বরুণ চৌধুরী

একটা কান্নার মতো বৃষ্টি পড়ছে নিউইয়র্কের নির্জন ফিফ্‌থ অ্যাভিনিউয়ে, ভিজে হাচ্ছে মানুষটার ভেতর পর্যন্ত। ঠিক এই মুহূর্তে একই বৃষ্টিতে ভিজছে কতো দূরের কৃষিজীবী ভারত। ভেতরটা বড়ো ফাঁকা লাগে। বুকের মধ্যে কোথা থেকে গুমরে ওঠে পথের পাঁচালীর দুর্গার মৃত্যুদৃশ্য। দুর্গার মায়ের ফুঁপিয়ে কান্নার মতো মৃত্যুদৃশ্যের সেই ভারতীয় বাজনাটা থেকে থেকে ডুকরে ওঠে। মনে পড়ে নিজেরও একটা মেয়ে ছিল আর অমনি একজন গরীব মা···রাত্তিরে চটের থলি বিছিয়ে শোয়া···। এই লাইনগুলো যাঁর সেই সল বেলো জীবনে কিন্তু কোনদিন ভারত দেখেন নি। তবু তার রক্তে খেলা করেছিল কি দূর ভারতের বিষণ্ণ বিয়োগান্ত স্বপ্ন!

বর্তমান এ্যামেরিকার সব থেকে জানা লেখক সল বেলো সম্বন্ধে যদি বলা যায় যে তার রণতরী আছে, কিন্তু তা দেশান্তরী স্বপ্নে ভরা, বারুদের দেশে তাঁর আগ্নেয়াস্ত্র হলো পরিহাস, তাহলে হয়তো নানাভাবে আপত্তি উঠতে পারে। সল বেলোর আবার স্বপ্ন? এ তো প্রায় স্টেট ব্যাঙ্কের লকারে প্রজাপতি চাষ করার মতো হাস্যকর। আসলে কিন্তু মানুষের চরিত্রের এই হাস্যকর দিকটাই সল বেলো তুলে ধরতে চেয়েছেন তাঁর সৃষ্টিতে। সমূলে উৎপাটিত হয়ে, ভিটেমাটি চাটি করে সল বেলো পরিবারকে দেশান্তরী হতে হয়েছিল দু-দুবার। রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে কানাডার মন্ট্রিয়েল শহরে ইহুদি পিতার চতুর্থ সন্তান হিসেবে ১৯১৫ সালে সলবেলোর জন্ম হয়।

আবার উনিশশো চব্বিশে তারা পাকাপাকিভাবে চলে আসেন শিকাগোর ডিভিশান স্ট্রিটের অন্ধকারে। ফলে মানুষের সভ্যতা সম্পর্কে সংশয়ের একটা তীব্র ঝোড়ো হাওয়া কাঁপিয়ে দিয়ে গেছে বেলোর সৃষ্টির বনভূমি। অজস্র লাল ঝরাপাতায় ভরা সেই বনপথেই আমরা সল বেলোর বহু একর-ব্যাপী সৃষ্টির সীমানা দেখতে পাই। সেখানে গাছের একটিও পাতা না থাকলেও পাখির বাসায় কিছু গোপন স্বপ্ন ছিল। মানুষ কেমন করে কি নিয়ে বাঁচবে? যেখানে কোনো বোঝাপড়া নেই, নিষ্ঠুর বন্যায় ভেসে গেছে স্বামী-স্ত্রীর অন্তরাল রেলপথ, ধর্মান্ধ মানুষের বিষাক্ত হাওয়ায় কতো নিরীহ জীবনকে ভেসে যেতে হয়েছে দেশ ছেড়ে, সেখানে কতটুকু দাম মানুষের সভ্যতার গলাবাজির?

সল বেলোর আগে আরো যে ছ'জন এ্যামেরিকান সাহিত্যিক নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাঁরা হলেন যথাক্রমে সিন্‌ক্লেয়ার লুইস (১৯৩০), ও-নিল্, পার্লবাক, ফকনার, হেমিংওয়ে এবং স্টেইনবেক (১৯৬২)। উনিশশো তিরিশ থেকে উনিশশো বাষট্টি—এই বত্রিশ বছরে দুনিয়ার সর্বত্র যেভাবে পাল্টেছে, এ্যামেরিকাও তার ব্যতিক্রম নয়। মজা হচ্ছে ১৯৪৪এ যখন 'ড্যাংলিংম্যান' বেরুলো তখন থেকেই বেলো অন্য লেখকদের থেকে ভিন্নপন্থী। প্রথম থেকেই একটা কঠিন আখরোটের খোলা দিয়ে তাঁর সৃষ্টি ঢাকা ছিল, ভাঙতে পাঠককে বেশ বেগ পেতে হয়। সেই শক্ত খোলার ওপর ঝড় জল রোদের মতো বহু পুরস্কার আছড়ে পড়েছে। এ বছরেই গত মে মাসে 'হুমবোল্টের উপহার' লিখে নিজে উপহার পেলেন এ্যামেরিকার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পুলিটজার। কিন্তু পুরস্কারের গলা-জলে দাঁড়িয়েও বরং খ্যাতির দিকে পিঠ ফিরিয়েই লিখছিলেন সল বেলো। হয়তো খ্যাতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ ছিল না বলেই তাঁর লেখা কখনই সস্তা হয় নি এবং তাঁর লক্ষীর ভাঁড়ে অন্ধকারে অনবধানে জমে গেছে বেশ কিছু সততা। প্রথম থেকেই এমন শক্ত কাঁটাতারে বেলো তার সৃষ্টিকে ঘিরে ফেলেছেন যে অনধিকারীর হুট্ করে ঢুকে পড়া অসম্ভব। কোন যৌনতার হিড়িক নেই, প্রেমের ন্যাকামি নেই, কোনো নরম গরম গল্প ফাঁদার চেষ্টা অথবা রাজনৈতিক কেচ্ছার জগঝম্প নেই—সত্যি কথা বলতে কি বেলোর সমগ্র সৃষ্টিতে একটা গরম জ্যাবড়া চুমু খাওয়ার যোগ্য একটি মহিলা চরিত্রও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

ভুললে চলবে না পঞ্চাশের দশকেই কিন্তু এ্যামেরিকায় ঢুকে পড়েছে

'বীট' লেখকেরা। আর সেইসঙ্গে ইংলণ্ডে শুরু হয়ে গেছে 'রাগী ছোকরা'-দের তুমুল দাপাদাপি। বেলো তখন সবেমাত্র তাঁর তৃতীয় উপন্যাসে হাত দিয়েছেন। এবং মনে হয় এই তৃতীয় উপন্যাস 'অজি মার্চের অভিযান' থেকেই তিনি নির্জন কলম্বাসের মতো যে দ্বীপটি আবিষ্কার করতে শুরু করেছেন তারই নাম আধুনিক এ্যামেরিকা, সেই সময় হাতে বোমা নিয়ে যে সব সাহিত্যিকরা সাহিত্যজগতে ঢুকেছিলেন, তাদের সকলের সঙ্গে সময়ের একই ডিনার টেবিলে বসেও হয়তো ফুলদানি অথবা গেলাসের গোবেচারা ছায়ায় নিদেনপক্ষে একটা ফুলদানির আড়ালে সল বেলো কেমন যেন মুখ লুকিয়ে ছিলেন। আগেই বলেছি সাতসকালে বোমা ফাটিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে শোরগোল তোলার মানুষ নন সল বেলো। কিছুটা অবিশ্বাসী, আপাত নিরপেক্ষ, বেশিটাই একা একা ব্যঙ্গের হাসিতে ঠোঁট বেঁকিয়েছেন। জ্ঞানী মানুষ তার ভদ্রতা সভ্যতা শিষ্টতা ধৃষ্টতা অথবা স্রেফ বাঁদরামি নিয়ে ছারপোকা অথবা ছাতারে পাখির মতই এলেবেলে কাজ করতে পারে, সেটা আশ্চর্যের কিছু না।

এমনি একটা ট্যারাবাঁকা অবিমিশ্রকারিতার আয়নায় নিজের মুখ দেখলে মানুষ হেসে ফেলতে বাধ্য। সলবেলোর সঙ্গে 'বীট', 'রাগী' অথবা অন্য সমস্ত সমসাময়িক লেখকের পার্থক্য ঐখানেই। 'বীট' নামটা তাদের নাটের গুরু জ্যাক কেরুয়াকের দেওয়া। অন্যপক্ষে 'রাগী ছোকরা' বা **Angry youngman** নামটা স্রেফ ফ্লিট স্ট্রিটের দেওয়া কাগুজে নাম। এ্যামেরিকার বীটরা তেমন কোনো রাজনীতির ধার ধারতো না, আর ব্রিটেনের রাগীর দল রাজনীতি-গেলা চরম মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতিভূ হলেও তারা আবার কোনো কিছুরই ধার ধারতো না। বেলো এই দুইয়ের কোনোটাই গিলতে চান নি। জগতের কোনো কিছুই মানি না ব'লে একটা জ্যান্ত কালাপাহাড়ের মতো সব কিছুই ভাঙতে হবে—এমন কোনো খুনে মনোভাব বেলোর নেই: **'We must get it out of our heads that this is a doomed time.'** (Herzog)। তাঁর সৃষ্টিতে বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে কেমন একটা জান্তব ভীতি আছে। হয়তো খানিকটা মুখ ফিরিয়ে নেওয়া অনীহা। কিন্তু এই ভীতি এই অনীহাকে কখনই তিনি ঠাণ্ডা পাণ্ডার মতো উদাসীনতা দিয়ে প্রকাশ করতে চান নি। বরং পরিহাসে, নিষ্ঠুরভাবে খেপিয়ে দিয়ে, খুঁচিয়ে দিয়ে বেলো দেখাতে চেয়েছেন কতো ক্লান্তিকরভাবে

পচা এইসব জ্ঞান বুদ্ধি সভ্যতা। রাগ ঘৃণা হিংসার যাযাবর-বৃষ্টি পর্যায়ক্রমে মানুষের সর্বাঙ্গ ভিজিয়ে দিয়ে যায় ঠিকই। তবু **'There is an element of comic or fantastic in everyone. You can never bring that altogether under control' (Victim)**। হাজার হাজার লোভের ঘোড়া ছুটে বেড়াচ্ছে আমাদের চারিদিকে আর আমরা একসঙ্গে সবগুলোর পিঠে চাপতে গিয়ে অনবরত আছাড় খাচ্ছি। আমরা প্রায়ই ভুলে যাই যে একই সঙ্গে অনেকগুলো ঘোড়ার সওয়ার হওয়া কখনই সম্ভব নয়। এটা ভুলে যাওয়ার জন্যেই আমাদের মধ্যে এতো মেঘলা হাহাকার।

বেলোর অফুরন্ত উজ্জ্বল বক্তব্যভরা সৃষ্টির বর্ণালি পেরিয়ে যে পেশীবহুল লোমশ অন্ধকার আমাদের টুঁটি টিপে ধরে সেই অন্ধকারের অন্য নাম অসহায়তা। প্রশ্ন সেখানে একটাই **'How should a goodman live ?'** তেমন আধুনিক ব্যক্তিত্বের দরকার কি যা মানুষকে উপহার দেয় শুধু বেজন্মা হিংসে এবং বেকার লোভ। কিন্তু এইসব হলদে বেগুনি মানুষের জন্যে বেলো যে খুব দুঃখিত তা বলা যায় না। মানুষকে কৃপা করাও তাঁর কাজ নয়। শুধু তীব্র ব্যঙ্গ দিয়ে তার অসহায়তাকে একটু উসকে দেওয়া, তার বিদ্যে বুদ্ধির তড়পানিকে থমকে দেওয়া। ব্যস। ইহুদি হিসেবে জন্ম অথচ খৃস্টান মশারির মধ্যে বাঁচা—এই দুইয়ের প্রভাবে বেলোর মধ্যে প্রায়ই জোড়া ঘণ্টা বাজতো। এটাকে জোড়া Syndrome বলতে পারলে বেশি ভাল হয়। কারণ, সলবেলো তো ধর্মাধর্মের রোগ ধরতেই চেয়েছেন খুব বেশি করে। এ্যামেরিকার অন্য আরো খ্যাতিমান ইহুদি লেখকদের সঙ্গে তাঁর নাম একসঙ্গে উচ্চারণ করলে কিন্তু বেলো বেশ কুঁকড়ে যান। পৃথিবীর সর্বত্র একঘরে করা ইহুদিদের যন্ত্রণার গোপন জলপ্রপাতের পাশে পাশে খৃষ্টানদের বেপরোয়া বাহাদুরীর পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে যদিও সল বেলো তাঁর বহু উপন্যাসে তর্কের ঝড় তুলেছেন, তবু নিজেকে উনি নিছক ইহুদিত্বের পেরেকে ঝুলিয়ে রাখতে চান না।

তাঁর লেখায় যাবতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান থেকে নানা দার্শনিক আলোচনার ছড়াছড়ি। সেখানে সার্ত্র থেকে বুদ্ধের মতো নির্বিকার মুখেরও অভাব নেই। কিন্তু সবই এহ-বাহ্য। সমস্ত তর্কাতর্কির ধূম ধাড়াক্কার আড়ালে বেলো যেন ফিসফিস করে বলতে চান—নিজের দিকে তাকিয়ে বলো কালো কফির সঙ্গে মোষের শিংয়ের গুঁড়ো মিশলে মজাটা

কোথায়। আসলে বেলো চেয়েছেন 'স্বঘাচিত নিয়তি'র কাঠগোড়ায় দাঁড়ানো মানুষকে তার নিজস্ব রূপে দেখতে। সেখানে ঘুমন্ত যৌনতার সুড়সুড়ি দিতে র‍্যাকয়েল ওয়েলসের মতো উরুদ্বয়েরও প্রবেশ-নিষেধ। সেইজন্যেই হয়তো মেয়েদের ঠোঁটে রংমাখাটাও তাঁর চোখে একঘেয়ে যৌনতার প্রতীক হয়ে দেখা দেয়: **'Universal device of sensuality for all women.'**

সল বেলোর প্রথম বইয়ের নাম 'ড্যাংসিংম্যান' (১৯৪৪)। কি ভাবে একটা মানুষ নিজেকে কোনোখানেই ঠিক খাপ খাওয়াতে পারছে না—এটাই হলো উপন্যাসের নায়ক জোসেফের সমস্যা। যুদ্ধে নাম লিখিয়েছে অথচ তখনও ডাক আসে নি—এরকম একটা জোড়াতালি অবসরে জোসেফ নিজেকে ফালা ফালা করে দেখতে চাইছে। সে যতই ভাবছে ততই দেখছে আজকের বেশিরভাগ মানুষই যেন নিজের কাছে অদৃশ্য থেকে যায়। বাইরে শুধু তার রান্নার ঝোললাগা জামা কাপড়ের খোলশটা ঘুরে বেড়ায়, সে নিজে কিন্তু নিজের কাছে অচেনাই থেকে যায়। মজা হচ্ছে এই যে নিজেকে খোঁজার মধ্যেই কিন্তু উত্তর আছে অথচ জোসেফ সেটা কখনই টের পাচ্ছে না। যখন সে মৃত্যুচিন্তা নিয়ে খুব ব্যস্ত তখন তার বৌ যে তার অসুস্থতায় কতো নিঃস্বার্থভাবে সেবা করে চলেছে—সেদিকে তার একটুও খেয়াল নেই। খেয়াল নেই যে ঐ নীরব সেবার অঞ্জলিতেই কতো সহজ আনন্দের পানীয় তার ঠোঁটের আয়ত্বে থেমে আছে। মনে মনে জোসেফ যদিও জানে **"Goodness is achieved not in a vaccum, but in the company of other men attended by love"** তবু সে কিন্তু কিছুতেই নিজের কুনো খোলস থেকে বেরিয়ে সহজভাবে মানুষের হাত ধরতে পারছে না। ফুটন্ত সূর্যের তলায় নিজের যাবতীয় দোষ ত্রুটি ক্ষুদ্রতা নিয়ে সে ক্রমাগত নিজের মধ্যেই গুটিয়ে থাকছে। কিংবা বলা যায়, কঠোর ধার্মিকের নিষ্ঠা নিয়ে সে তার ক্ষুদ্রতাকেই ভেতরে ভেতরে লালন করছে এবং বুঝতে পারছে না মানুষের ইচ্ছেটা যখন শুভ ও পবিত্র হয় তখনও তার কাজগুলো কেন এতো বেখাপ্পা নোংরা আর অপবিত্র থেকে যায়।

পরের 'ভিকটিম' (১৯৪৭) উপন্যাসেও এই আত্মানুসন্ধান চলেছে, শুধু তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বেলোর সেই তীক্ষ্ণ পরিহাস যা মানুষের অসহায়তাকেই কঠোর করে অথচ অহঙ্কারকে একটুও প্রশ্রয় দেয় না। এখানে

মোটাসোটা ইহুদি নায়ক লেভেনথাল চারিদিকের **gentles**-এর মধ্যে অসহ্যভাবে বাঁচতে গিয়ে প্রশ্ন করছে, **Dear God, am I so lazy, so weak ; is my soul fat like my body ?** লেভেনথাল এখানে ভাল্লুকের মতই **clumsy** এবং ভাল্লুকের সঙ্গে তার মিল **'in their refusal to become involved with any-one outside themselves.'** মানুষের অসহায়তাকে এইভাবে জন্তু বানিয়ে এমনি মজাদার অথচ হৃদয় বিদারীভাবে লোফালুফি খেলতে দেখি আমাদেরই এক কবির কবিতায় : 'সহসা হাতঘড়ি দেখে লাফিয়ে উঠেছি, রাস্তা বাস ট্রাম/রিকশা লোকজন/ডিগবাজির মতো পার হয়ে, যেন ওরাংওটাং চার হাত-পায়ে ছুটে/পৌঁছে গেছি অফিসের লিফটের দরজায়'।

(হঠাৎ নীরার জন্যে—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)

লেভেনথালের আকারস্য প্রজ্ঞায় গভীর কোনো ভাবুকতা ধরা না পড়লেও সে তার নিজের মতো করেই কিন্তু ভাবতে পারে যেন সে মরীয়া হয়ে কেবলই ছুটছে **'running, as if in an egg race with the egg in a spoon.'**

সল বেলোর তৃতীয় উপন্যাস 'দা এ্যাডভেঞ্চার্স অফ অজি মার্চ' (১৯৫৩) সম্ভবত সেই উপন্যাস যেখানে ঘরকুনো ভাবুকতার দার্শনিকতা থেকে লেখক প্রথম বাইরের জগতে ছুটে বেরিয়ে এসেছেন। একটা খাঁটি **picaresque hero** বলতে যা বোঝায় অজির চরিত্র হুবহু তাই। এখানে বেলোর চিরন্তন বিদ্রূপের স্প্রিংয়ের ওপর দাঁড়িয়ে অজি সমানে জীবনের ম্যাজিক দেখাতে দেখাতে আমাদের হাসিয়ে প্রায় চোখে জল এনে দেয়। ঝকমারি ধরনের কতো বিচিত্র কাজের ভূমিকায় যে আমরা অজি-কে দেখি তার ইয়ত্তা নেই। যেমন **'welfare defrander, shoplifter, valet, boxing trainer, sporting goods model, dog-groomer, paint salesman, union organizer, professional student, coalyard worker, iguana hunter, merchant marine counselor, and black marketeer.** দুর্ঘটনা অসুখ দাঙ্গায় বার বার টুকরো টুকরো হয়েও অজি যে এতো দুরন্ত গতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে জোড়া লেগে ফের তিড়িংবিড়িং করে, তার কারণ হয়তো তার অসংখ্য জীবিকার মতো অনবরত একটার পর একটা প্রেমে পড়া।

তার প্রথম প্রেমিকা হিলডার শুকনো মুখ আর বুক ধড়ফড়ানি সত্ত্বেও অজি কি মরীয়া হয়ে তার প্রেমে হাবুডুবু খায়, আবার পরক্ষণেই বড় লোকের আদরে-গোবরে মানুষ এস্থার নাম্নী মেয়েটি, যে নাকি তাকে যৌন সংসর্গের ইঙ্গিত জানাতেই এক ধাক্কায় দূর করে দিয়েছিল, তারই পদতলে অজি কেমন অবলীলায় সত্যিকারের মূর্ছা গেল। আবার কিছু পরেই গোকি, যে নাকি দৈহিক মিলনের সময় পূর্ণ সঙ্গম উপভোগের বদলে মুখ দিয়ে অদ্ভুত সব শব্দ করে, তার জন্যই সে জীবন দিয়ে দিতে চায়। এছাড়া আরো আছে। হিমশীতল সিঁড়ি ভেঙে পঙ্গু এইনহর্নকে পিঠে নিয়ে তার নারী সেবার সুব্যবস্থা করে দিয়ে নিজে একটা নাম গোত্রহীন গোজামিল সঙ্গমে ভিড়ে যায় অজি। এসবই কিন্তু বেলোর বিভিন্ন নারীর মনিহারি দোকানে যৌনতা তৃপ্তির মেসিনরূপী পুরুষের প্রতি বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছু নয়। এখানে ক্লান্তির ছবি ফোটাবার জন্য প্রেমটা এঁটো থালা-বাসনের মতো পরের দিন সকালে বড় বাসি বড় গ্লানিময় দৃশ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। একেবারে সাম্প্রতিককালে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'কাগজের বৌ' নামে উপন্যাসের নায়কের সঙ্গে অজির মিল খুঁজে পেয়ে চমকে উঠতে হয়। সমস্ত অন্ধকার দৈন্যের পরেও অজির জীবনে মজা মরে না। অজি বলে তার নিজের মধ্যে **'the laughing creature for ever rising up.'**

'সিজ দা ডে' (১৯৫৬) উপন্যাসটির সঙ্গে আগের তিনটি উপন্যাসের সব থেকে বড়ো পার্থক্য হলো, আগের নায়কেরা কোনো না কোনো পৃষ্ঠপোষকের সাহায্যে (তা সে নিজের বৌ-ও হতে পারে) নড়বড়ে বেঁচে থাকার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে। এখানে নায়ক টমি উইলহেম কিন্তু জীবনযুদ্ধে বাঁচবার জন্যে কোথা থেকে কোনো সাহায্য পায় নি। টমি বলছে, **'Don't talk to me of being free. A richman may be free on an income of a million net. A poor man may be free because no body cares what he does. But a fellow in my position has to sweat it out until he drops dead.'** ইহুদী রক্তের একটা গোপন ডায়নামো এ উপন্যাসে খুব ধীরে অথচ অব্যর্থভাবে তাপবিদ্যুৎ সঞ্চার করেছে যা টপ ক'রে ধরা পড়ে না। আসলে টমি উইলহেম চরিত্রটা বেশ খানিকটা Schlemiel ধরন-ধারণে এবং অনুরূপ ছাঁচে গড়া। এই ধরনটা হলো, কিছুটা ভ্যাবলা জবুথবু ধাঁচের মানুষ যে নাকি অন্যের তো বটেই, এমন কি নিজের জন্যেও যাতেই হাত দেয় তাই ভণ্ডুল হয়ে যায়। নিজের খাটো

ব্যক্তিত্বের ঘাটতি পূরণ করবার জন্যে সে ক্ষণে ক্ষণে আয়নায় নিজের মুখ দেখে নেয়; ভাল সুট আর চুরুট মুখে দিয়ে নিজের ভোঁতা ব্যক্তিত্বকে চাপবার চেষ্টা করে। তবে মজা এই যে এসব লোক, যার সঙ্গে টাকা ঢেলে ব্যবসা করতে গিয়ে অনিবার্যভাবে সর্বস্বান্ত হওয়া যায়—এমন লোককেও ডুম করে নিজের শেষ সম্বল ধ'রে দিয়ে ফতুর হয়ে যেতে পারে। এইভাবেই টমি টেমকিন্‌কে টাকা দিয়ে ফতুর হয়ে গেল। এই সময় দুনিয়ায় যখন আর কাছের মানুষ কেউ রইলো না, নিঃসঙ্গ টমি তখন রাস্তায় হঠাৎ একটা আগাগোড়া অচেনা মানুষের মৃতদেহ দেখে ঠিক নিজের পরমাত্মীয়ের মতোই হাউমাউ করে কেঁদে ফেললো। কান্নার বিস্মৃতি দিয়ে নিজের মন ধুয়ে টমি উইলহেম তারপর আবার যেন ধীরে ধীরে ভালবাসার জগতে ফিরে এলো। একটা ধ্রুব অথচ সূক্ষ্ম প্রতীকে বেলো এখানে এমন অনেক কিছুর দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে চমকে উঠতে হয়।

১৯৫৯ সালে লেখা সল বেলোর 'হেণ্ডারসন্ দা রেন কিং' সেই ধরনের উপন্যাস যেখানে পুঁতির মতো ছড়িয়ে পড়া আকাঙ্খার একটি একটি করে তুলে মালা তৈরী করার ঝকমারি চেষ্টায় ব্যর্থ নায়ক হেণ্ডারসন সব ছেড়েছুড়ে আফ্রিকা চলে যায়। সেখানে একটি শিশুসিংহ এবং ছিন্নমূল মানুষের বাচ্চার মধ্যে নিজের বিক্ষত আত্মাকে ভালবাসায় স্নান করিয়ে সে তৃপ্ত হয়। কিছুটা ফ্যানটাসির মধ্যে দিয়ে এখানে যদিও লেখকের মূল উদ্দেশ্য আত্মানুসন্ধান তবু আগের থেকে নানাভাবে এ উপন্যাসের আঙ্গিক ভিন্ন প্রকৃতির। এখানে কোনো অভাবী মানুষের কুয়োর ব্যাঙের মতো অন্ধকার জীবনের দৈন্য নেই। আছে টেকসাসের এক কোটিপতির বিরাট আকাঙ্খার আকাশ-ছোঁয়া ইমারত এবং তারই একেবারে নিচের তলা বা বেসমেন্ট ফ্লোরে তার নিঃসঙ্গ আত্মার একা একা জেগে থাকা : **'He never knew what to do with life'**। হেণ্ডারসনকে প্রথম দৃষ্টিতে বড় নিষ্ঠুর নির্মম রূঢ় এবং প্রায় হৃদয়হীন ধরনের মানুষ মনে হয়। আসলে এর কোনোটাই কিন্তু তার রক্তে পাওয়া পাকা কোনো রোগ নয়, সবই আমবাতের মতো ক্ষণস্থায়ী। নায়ককে নিয়ে এ উপন্যাসেও তামাশার শেষ নেই। বিভিন্ন জন্তুর অভ্যেস আর প্রবৃত্তির সঙ্গে বার বার তাকে একাত্ম করা হয়েছে। শুধু হেণ্ডারসন্ নয়, তার বৌ লিলিও লেখকের ব্যঙ্গের হাত থেকে রেহাই পায় নি। একটা বিশাল বড়লোকের সুন্দরী বৌ হিসেবে তার মুখে সব

সময় বড় বড় আদর্শের কথা, মিষ্টি ভদ্রতা এবং সৌজন্যের অভাব নেই অথচ তার অগোছালো ঘরের গৃহিণী হিসেবে সে বেশ অপদার্থ এবং বড়ো বেশি নোংরা অন্তর্বাস পরে থাকে।

এ উপন্যাসের ভাষা নিয়ে নানা বিচিত্র পরীক্ষা করেছেন সল বেলো। একেবারে কথা ভাষায় কথাবার্তার পাশে পাশে সমানধারায় কিছু আশ্চর্য কবিতার ভাষা বহে গেছে খুব চুপিসাড়ে : **'I am out in the grass. The sun flames and swells, the heat it emits is its love too ..These are dandelions...I put my love-swollen cheek to the yellow of the dandelions, I try to enter into the green...।'**

১৯৬৪ সালে সল বেলোর 'হারজগ' উপন্যাসটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বেলো সাহিত্যজগতের সেই অমনিবাস পেয়ে গেলেন যা তাকে বিনা বাধায় খ্যাতির দুর্গম তীর্থে পৌঁছে দিতে পারে। হারজগের মধ্যে বেলোর নিজের জীবনের আকাশ সব থেকে নীল। অনেক জায়গায় লেখকের সঙ্গে নায়ক এমনভাবে মিলেমিশে একাকার যে তাদের আলাদা করা কঠিন। অন্য উপন্যাসের মতোই হারজগ হ'লো বেলোর সেই পরিচিত নায়ক যে জীবনের তুলো খুলে তছনচ ক'রে ছিন্নভিন্ন তুলোর মধ্যে গোটা বালিসটা পেতে চাইছে। পুরোটাই ভেসে চলা স্মৃতি, স্মৃতির মধ্যে তন্নতন্ন ক'রে নিজেকে খোঁজা। জীবনের হাজার ঘটনার জলজ লতাপাতা ঠেলে নিঃসঙ্গ হারজগ একলা দাঁড় টেনে এগিয়ে যাচ্ছে। পাছে কিছু ভুল থেকে যায়, বাকি থেকে যায় কাউকে তার পাহাড়প্রমাণ ভুলের জন্যে তিরস্কার জানানো—তাই দরজির দোকানে গিয়েও হারজগ নোটসের মতো চিঠি লিখে চলে। সেসব চিঠিতে কোনোদিন পোস্টমার্ক পড়বে না। কারণ ওইসব চিঠির প্রেরক আছে কিন্তু প্রাপক নেই কেউ। সব নিজেকে শোনানো, নিজের জন্যে বানানো সহস্র স্থলপদ্মের লাল অভিযোগ। এত সব অভিযোগ আর লড়াইয়ের মধ্যেও কিন্তু ছড়িয়ে আছে একটা গোটা শরতের হাসিখুশি রোদ।

হারজগ কখনো ভাবছে আমাদের চুল আচড়াবার সুবিধের জন্যে অথবা শুয়োরের পেছনকার পায়ের মাংস গতকালের থেকে দেরে কতটা সস্তা যাচ্ছে এই খবরটা কাগজে পড়ার সুবিধের জন্যেই আলো প্রতি সেকেণ্ডে পৌনে একলক্ষ মাইল ছুটে চলে।

স্ত্রী ম্যাণ্ডেলিনের চরিত্রটাও দারুণ পরিহাসে ঝলমল। ম্যাণ্ডেলিন শুধু

রূপসী নয়, তার কেইরকেগার্ড থেকে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস—কিছু জানতে বাকি নেই। ম্যাণ্ডেলিনের সব ছলছুতো হারজগ আগে থেকেই বুঝতে পারে, তবু না বোঝার ভান করে এবং শেষ পর্যন্ত বৌয়ের যৌনাঙ্গের ডায়াফর্মের মাপ বন্ধুকে ঘোষণা করে স্পষ্টই জানিয়ে দেয় যে ম্যাণ্ডেলিনের অন্যের সঙ্গে শোয়াশুয়ির ব্যাপারটা সে সবই জানে। খানিকটা নিষ্ঠুর ধরনের মজা করা হয়েছে রমোনা নামক মেয়েটির সঙ্গে যে বয়েসের উত্তর তিরিশে এসে এখন শুধু একটি ফুল-টাইম স্বামী পেতে চায়। তার জন্যে সে হারজগকে দামী পানীয় ঢেলে, নিজহাতে রান্না করা তার নগ্ন শরীরের ভেতরে আসবার মুক্ত আমন্ত্রণ জানায়। কষ্ট সেইজন্যই যে এতো সত্ত্বেও আড়ষ্ট হারজগ তাকে যৌনতার পাঠশিক্ষার মাষ্টারনি ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না। এইরকম কাটা ঘায়ে নুন ছেটানো বিদ্রূপ হারজগ নিজেকে নিয়েও কম করে নি।

নিজের বাচ্চা মেয়েকে ভালবেসে একদিন তাকে নিজের গাড়িতে করে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে এমনভাবে অন্য একটি গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা মারে, পাঁজরের হাড় ভেঙে অজ্ঞান হয়ে এবং লোডেড্ রিভলভার সমেত ধরা পড়ে শেষ পর্যন্ত হাজতে যেতে হ'লো। এই অবস্থাতেই কিন্তু হারজগ নিজেকে বলছে: **'You burnt the house to roast the pig. It was the way humankind always roasted the pig'**। এই ঘটনা থেকে হারজগের নিজের আহাম্মক এবং বেয়াক্কেলে পরিচয়টাই দুনিয়ার মানুষের চোখে পড়ে। বৌ ম্যাণ্ডেলিন থেকে সবাই জানতো হারজগের মাথায় ছিট আছে। শুধু হারজগই জানতো আধুনিক সভ্যতার আসল পাগলামিটা কোথায়। এ্যামেরিকার প্রেসিডেন্ট থেকে ভারতের বিনোবা ভাবে—সকলের সম্পর্কেই হারজগের বক্তব্য আছে, বলার কথা অনেক। শুধু মানুষের বোকামি আর পাগলামি নয়, তার মৃত্যুচিন্তা, মৃত্যুকে রোম্যান্টিক মর্যাদা দেবার বাড়াবাড়ি আর জীবনের দুঃখ-দৈন্য নিয়ে কাঁদুনি গাওয়া—এ সবকিছু স্পষ্টই বেলোর নিজের বক্তব্য, হারজগের মধ্যে প্রতিধ্বনিত। সুযোগ বুঝে ধর্মীয় সংস্থা বা চার্চের নিরীহ মানুষের কাছে সবজান্তা সাজার ব্যাপারটাকেও নির্মমভাবে ঠাট্টা করা হয়েছে: **'Readiness to answer all questions is the infallible sign of stupidity।'**

মানুষের সম্পর্কে এতসব বিষ ঢালা সত্ত্বেও কিন্তু বেলো কখনই মানুষের

ওপর বিশ্বাস হারান নি। তাঁর মতে এই বিশ শতকেও মানুষ হলো: **'Man with a Capital M, with great stature'**।

১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয়েছে 'মিস্টার স্যাম্পলার্স প্ল্যানেট'। তারপর ১৯৭৫-এ আপাতত সল বেলোর সর্বশেষ উপন্যাসের নাম 'হুমবোল্টস্ গিফট'। এ দুটি উপন্যাসেই বুদ্ধিজীবীর চশমায় দেখা দুর্জয় জীবাণুর মতো মানুষকে নিয়ে বেলোর নিজস্ব পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ নেই। মনে হয় শেষ দিকে বেলো তাঁর সেই রোদপড়া পরিহাসে ঝকঝকে ইস্পাতের ছুরিটা কোথাও হারিয়ে ফেলেছেন। এখানে যেন বড়বেশি বুদ্ধিজীবীর গায়ের গন্ধ। শিল্পী বেলোর থেকে এ্যানথ্রপলজি পড়া শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বেলোর সত্তাই যেন এখানে প্রবল। বড়বেশি বুদ্ধি আর পাণ্ডিত্যের জরে আগের কালের সেই অজি যেন কিছুতেই আর গা-ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াতে পারছে না। স্যাম্পলারের গ্রহে যদিও গল্পের একটা স্বাভাবিক টান আছে, তবু বৃদ্ধ স্যাম্পলারের মনে মনে বলা সমস্ত সারকথা বড়ো বেশি বুক চেপে ধরে। এখানেও যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপের মোটর রেস একেবারেই নেই তা নয়, কিন্তু সব কিছুই মোড় নিয়েছে বুদ্ধির যত ঘোরালো গলিপথে। সবেতেই নেচে ওঠা হুজুগে এ্যামেরিকানদের চাঁদে যাওয়ার জন্যে ধড়ফড়ে লাফালাফি, পৃথিবী ছেড়ে চাঁদে উপনিবেশ স্থাপনের জন্যে লক্ষ লক্ষ ডলারে স্বপ্ন কেনার আগ্রহ—সবই স্বপ্নের লুনার অভিযানের মতো **'Lunatic'**। এই খুচরো পৃথিবীটা হলোই বা রোগ-ভয়-অভাব-অন্ধকারে পঙ্কিল, তবু এটা ছেড়ে সম্পূর্ণ অচেনা ও জীবনধারণ অসম্ভব এমন একটি গ্রহে ছুটে পালাবার হ্যাংলামিটাও তো এক ধরনের অসুখ ছাড়া কিছু নয়। এখানে চাঁদে উপনিবেশ স্থাপনের প্রবক্তা কলকাতার ছেলে গোবিন্দলাল কিন্তু স্বচক্ষে ছেচল্লিশে হিন্দু-মুসলমানের রক্তাক্ত দাঙ্গা দেখেছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সেটাই কি সব, পৃথিবীর এটাই কি এক এবং অনন্য চেহারা? 'হুমবোল্টস্ গিফট'-এর এমন প্রশ্নই আরো গভীরে ঢুকে আত্মার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চেয়েছে।

সলবেলোর সৃষ্টির বিরাট লোহার গেট ঠেলে ফট করে ভেতরে ঢুকলে, প্রথমেই দমকা হাওয়ার মতো যা আমাদের বিভ্রান্ত করে তা হলো, মানুষকে পরিহাস করাই যেন লেখকের সব উপন্যাসে ঘুরে ফিরে এসেছে। আসলে কিন্তু ব্যাপারটাকে অত সরল করলে নিজেদেরই ঠ'কতে হবে। কারণ,

বেলোর পরিহাস কখনই একরকম নয়, লোহার জুতো পরানো পায়ের মতো আড়ষ্টও নয়। প্রথম দিকের আগোছালো ভাবটা ক্রমেই বুদ্ধি আর হৃদয়ের আঁচে জমে দানা বেঁধে গেছে। আয়নার ভাঙা কাঁচে নিজের অজস্র আঁকাবাঁকা মুখ দেখার অভিজ্ঞতাও কম নয়। সলবেলো মানুষকে অমরতা দেবার জন্যে স্বর্গ-মর্ত-পাতাল জোড়া কোনো বিরাট মহাকাব্য লেখার দায়-দায়িত্ব নিয়ে আসেন নি। ছোটমানুষ, বোকামানুষ, বেঁটেমানুষ, মোটামানুষ এবং বনমানুষ—এরা সবাই বেলোর সৃষ্টির অধিবাসী, অন্য কোনো মহাপ্রাণী নয়। এদের তিনি কাঁধে তুলে স্বর্গ ছোয়াতে চান নি। আবার এদের স্রেফ ফুটপাথে কেনা পোকালাগা পচা পেয়ারার মতো থু থু করে ছুঁড়ে ফেলতেও চান নি। কারণ বেলো জানেন: **'There's really very little that a man can change at will. He can't change his lungs, or nerves, or constitution or temperament. They are not under his control'।**

ফলে এসব নিয়ে মিথ্যে হা-হুতাশ করে লাভ কি। তার থেকে ওদের দিকে ভিভ ভ্যাঙালে দেখা যাবে ওরাও বাচ্চা ছেলের মতো ভেংচি দিয়েই প্রত্যুত্তর দিচ্ছে এবং হেসে ফেলছে। সল বেলো কখনই কোনো ফুটফুটে গল্পের ফাঁদ পেতে জীবনের মাছি ধরতে চান নি। হয়তো সেই জন্যেই তার মনস্ক এবং বয়স্ক পাঠকের সংখ্যা বেশি না। তাছাড়া বেলোর সৃষ্টি তাঁর নিজস্ব চিলিসসে বড়ো বেশি লাল যা ঠিক পেট রোগা মানুষের জন্যে নয়।

সেপ্টেম্বরে ফলের লাল রোদে ভরা ম্যানহাটনে দাঁড়িয়ে হ্যামবার্গারে কামড় দিতে দিতে হয়তো একমাত্র বেলোই ভাবতে পারেন, মানুষের এই ক্ষিদেটাই কি সব? নাকি এর থেকেও ভয়ঙ্কর কোনো ক্ষিদে অন্য কারুর বুকে ওৎ পেতে আছে যা শুয়োরের মতো কদাকার হলেও; শসা-প্যাঁজ দিয়ে খেতে মন্দ লাগে না।

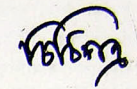

সবিনয় নিবেদন,

প্রবন্ধশীর্ষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন ব্যবহার করলেও নিত্যপ্রিয় ঘোষ শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে মার্কসিজমের গোরস্থানই আভাসিত করেছেন। চমক আর চাতুরিকে প্রশ্রয় দিয়ে তিনি 'গুরুদেব'-প্রশস্তির নিত্যক্রিয়ার গড্ডলিকা-প্রবাহে বিলীন হতে চেয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে 'প্রগতি-শীলতার ধারক' বলে রায় দেবার আগে, 'মার্কসবাদী' বুদ্ধিজীবিতাকেও যে বাদী পক্ষের যুক্তি খণ্ডনে আরও একটু সৎসাহস ও তৎপরতা দেখাতে হবে!

শ্রেণীস্বার্থে, ব্যক্তিস্বার্থে, রবীন্দ্রনাথ স্বজাতির পরাধীনতার বেদনা ও সংগ্রামী ঐতিহ্যের সত্যরূপ আঁকতে পারেন নি—সাহিত্যে। ফলে সমাজদর্পণ হিসেবে তাঁর সৃষ্টি হয়ে পড়েছে অসৎ। এই অসততা তথা ইতিহাস-বিরোধিতাকে ঘৃণা ছুঁড়বার জন্য 'মার্কসীয় দর্শনের পুরোবিচার শেষ' হলো-কি হলো না, তা খুঁটিয়ে দেখবার কোনো প্রয়োজন আছে কি? 'বাংলাদেশে তখন মার্কসীয় দর্শন খুব পরিচিত ছিলো না' কিংবা 'তৎকালীন মার্কসবিদ্ বাঙালি লেখকেরা···মার্কসকে হাস্যকর অবস্থায় উন্নীত করে দিয়েছিলেন' এ জাতীয় মন্তব্য মারফত কি বিশ্বকবির সততা-সরলতা প্রমাণ করা সম্ভব? এই ভাগ্যবান ভারতীয় কবি অজস্রবার ইয়োরোপ আমেরিকার নানা তীর্থ ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছিলেন, পরিশেষে বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় গিয়ে তাঁর তীর্থ-পরিক্রমা শেষ করেছিলেন। কিন্তু মার্কসবাদ-লেনিনবাদ বিষয়ে তিনি কখনও কোনো আগ্রহই প্রকাশ করেন নি, পাছে তাঁর ঔপনিষদিক মোহজালটা খসে পড়ে—এই ভয়ে। অপিচ কমিউনিস্টদের তিনি বলে বসেছিলেন 'মানুষথেকো,' আর মার্কসীয় দর্শনকে এমন এক

সঙ্কীর্ণ—'সোভিয়েট আদর্শ' বলে বিদ্রূপ করেছেন, যা কেবল রাশিয়ানদের উপরই নাকি প্রযোজ্য! প্রলেটারিয়েটের স্ল্যাঙার করতেও তড়িঘড়ি তিনি খুশিমতো উপমা গড়ে নিয়েছেন, নইলে দেখতে পেতেন যে—জনস্রোতে যেমন জাতির পরিচয়, তেমনি নদীর পরিচয়ও তার জলস্রোতে, দেহের প্রধানাংশে; সংখ্যালঘু ঐ স্রোতোঘাতী নুড়ি-বালিতে নয়। 'জন্মব্রাত্য', আশৈশব 'শ্রেণীভ্রষ্ট', ইত্যাকার স্ব-প্রদত্ত আখ্যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন বক্তৃতার লাগাম ছেড়ে দেন, তখন অতি সহজেই বোঝা যায় যে, 'স্বৈরাচারী বুদ্ধিজীবী' কী বস্তু, আর তাঁর অহং বোধটাও কী পরিমাণ। উচ্চবিত্ত জমিদার হলেও নাকি তিনিই বুঝেছেন গরিবের বেদনা, দাঁড়িয়েছেন তাদের পাশে গিয়ে। বাংলাদেশের 'মাহাত্ম্য' নাকি তাঁর আগে এমন করে আর কেউ দেখেনি, 'বাংলার পল্লীর গল্প' আর কেউ প্রকাশ করেনি। কিন্তু আগে করাটাই কি হক-কাজের প্রমাণ হলো? তিনি তো জানার কোনো তোয়াক্কাই করেননি যে প্রকৃত ভারত কিংবা বাংলাদেশের মাহাত্ম্য আদৌ তার পদ্মাকুলের কল্পিত ছায়া-সুনিবিড়-শান্তির নীড়ের 'গৃহধর্মে' নয়, 'নির্লিপ্ত আত্মার বন্ধন-মোচনে'ও নয়, সে শুধু তার কৃষককুলের শোষণবিরোধী সংগ্রামে, আর সত্যকার প্রতিবেশী সুলভ ঐক্য-সহযোগিতাময় জীবনায়নের সুতীব্র বাস্তব আকাঙ্ক্ষায়।

ভারতের অখ্যাত-অজ্ঞাত মানুষ তো মেঘদূতেরও নায়ক-নায়িকা। এমন গ্রাম্য মানুষের সুস্থ সংগ্রামটুকু পর্যন্ত আঁকা হয়ে গিয়েছিলো বাংলার 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'নীলদর্পণ', 'জমিদার-দর্পণ' নাটকে। ছোটগল্পের অঙ্গনে এই মানুষদের কিছু বিকৃত ছবি গড়ার জন্যে রবীন্দ্রনাথ কোন গৌরব দাবী করবেন—তা বোঝা দুষ্কর। রবীন্দ্রযুগ 'ঘোরতর সামন্ততান্ত্রিক যুগ'—এটাই যদি সত্যের পূর্ণরূপ, তবে তো 'সিপাহীবিদ্রোহ', 'নীলবিদ্রোহ', হরিশ মুখার্জীর স্বাদেশিকতামুখর নির্ভীক সাংবাদিকতা, হানিফ-তোরাপের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বর্ণের উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে হিন্দুদের সংগ্রাম ও তার সাহিত্যরূপ এবং মঞ্চ-প্রযোজনা, সর্বোপরি ঈশ্বরোপম ইংরেজের সম্প্রসারণ-বাদিতার প্রতি ঘৃণাবর্ষী কাব্য 'মেঘনাদ বধ'—এ সমস্তেরই প্রভাব-আবির্ভাব ব্যর্থ হয়ে গেছে ভাবলে সমাজ-সত্য, যুগ-সত্যেরই অপলাপ করতে হয়! কিন্তু তাতেই বা লাভ কী? আসলে ঠাকুর পরিবার ইংরেজ-আনুগত্যের জোরেই শ্রীহীন দেশে লক্ষ্মীর ঝাঁপির শরিক হতে পেরেছিলো। ইংরেজের শোষণ-

শাসন-কেন্দ্র কলকাতার এই বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের সিংহদ্বারে 'পশ্চিম' তার ডাক নিয়ে হাজিরা দিয়েছিলো। স্বভাবতই প্রিন্স-পৌত্র রবীন্দ্রনাথ স্বজাতির পরাধীনতামূলক দুঃখ-যাতনার থেকে দূরে দূরে শান্তিনিকেতনী আনন্দলোক গড়ে তুলেছিলেন। তাই ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের তুচ্ছ নাইট-উপাধি-ত্যাগের তুচ্ছতর ইচ্ছেটাকে যেমন গৌরস্থানে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, তেমনি ক্রমে ক্রমে বুঝে গিয়েছিলেন যে, 'জগৎকে বেষ্টন' করে আছে যে 'ধনিকের স্বার্থজাল,' তিনিও তারই এক ক্ষুদ্র সহযোগী। ফলে তাঁর 'ভিতর থেকে প্রকাশ' করা সৃষ্টি 'চার অধ্যায়' প্রভৃতি গ্রন্থে শাসকপক্ষে ওকালতি করতেও তিনি এগিয়ে ছিলেন, শুভময় কৃতজ্ঞতাবশে! তবে বরাবরই তাঁর ভাবখানা এমন ছিলো, যেন ভারতীয়দের স্বার্থেই তিনি ভারতবিরোধী। কমিউনিষ্ট পার্টির ম্যানিফেষ্টো উদ্ধৃত করে বলা যায় যে, **the bourgeois is a bourgeois—for the benefit of the working class!** তাই ভারতের তাজা তরুণ ক্ষুদিরাম থেকে সূর্য সেন, রামপ্রসাদ বিসমিল-ভগৎ সিং থেকে উধম সিংরাও যখন স্বদেশের স্বার্থে দলে দলে প্রাণ দিচ্ছে অকাতরে, তখন রবীন্দ্রনাথ গান গাইছেন—নহ মাতা নহ কন্যা··· জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে···মঙ্গললোকে···মাথা নত করে দাও····· ভারতভাগ্যবিধাতা প্রভৃতি! মেঘনাদী পরাক্রমের মধ্যে কোনো মহত্বই খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি; বরং 'একটি আষাঢ়ে গল্প' লিখে বুঝিয়ে দিচ্ছেন—বিদেশী রাজপুত্র-কোটালপুত্র-বণিকপুত্র কিভাবে ভারতীয় তাসের দেশের নিষ্প্রাণ স্থবিরতার মাঝে প্রাণবন্যা বইয়ে দিয়েছে। কৃতজ্ঞ কবির এই আষাঢ়েপনাই 'অচলায়তনে' বিদেশী 'শোণপাংশুদের' বীরগাথা গেয়ে উঠেছে। আইরিশ শিশু 'গোরা'র জন্মসূত্রেও বিদ্রোহী সিপাহীদের নৃশংসতাটুকুই শুধু আভাসিত। হতভাগ্য কোনো ভারতীয় সিপাহীর অনাথ পুত্রকে নিয়ে কি ভারতীয়ত্বে উত্তরণের এ গোরা-কাহিনী গড়া যেতো না? এণ্ড্রুজ সাহেবের প্রেরণায় রবীন্দ্রনাথ মানুষের উপর বিশ্বাস ফিরে পেলেও শাসক-শিবিরে আপন অবস্থানের সাহিত্যিক স্বীকৃতির মধ্যে দিয়েই মার্কস-নির্দেশিত শ্রেণীদ্বন্দ্বের সাক্ষী হয়ে পড়েছেন।

'সাহিত্যে মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায়'—ঠিকই, কিন্তু শোষণ তথা বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে উন্নতশির শ্রমজীবী মানুষের মেঘনাদী সংগ্রাম কি মনুষ্যত্বের মহত্তম প্রকাশ নয়? অথচ পরপদানত দেশের মর্মলোকের প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব

নিয়ে রবীন্দ্রনাথ মনুষ্যত্বের এই গৌরবান্বিত দিকটিকেই আঁধারে রাখতে চান। অত্যাচারীকে আড়াল করে রাখেন, অপরূপ কৌশলে। বেগার খাটা ক্রুদ্ধ কৃষক খিদের জ্বালায় আপন স্ত্রীকে খুন করে বসে, ভাতৃজায়ার ফাঁসির মঞ্চের দিকে অসহায় দৃষ্টি নিয়ে 'শাস্তি' পেতে থাকে। অথচ এই ক্রোধের যোগফলে যে সামাজিক বিপ্লব, তার নিন্দায় রবীন্দ্রনাথ পঞ্চমুখ। বিদেশী শোষণপাংশুদের সহিংস আঘাত তাঁর অভিনন্দন পায়, কিন্তু স্বজাতির হুঙ্কার-হিংসা তাঁর একেবারেই না-পছন্দ। কবির সুখী, সুবিধাবাদী আত্ম-কেন্দ্রিকতা নয় হয়ে দেখা দিয়েছে তাঁর 'একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্পে,' যেখানে 'জন্মগত···আকস্মিকতার' কাঠঠোকরা-কাঁদাখোচার রূপকের খোলশে বঞ্চিত অন্নহীনদের সম্পর্কে তাঁর অশালীন ব্যঙ্গ আমাদের ঘৃণা কাড়ে। সুতরাং বিত্তহীন মানুষকে গল্পে স্থান দেওয়াটাই বড়ো কথা নয়। বিত্তহীন-তার সমস্যাকে গল্পের কেন্দ্রে রেখেছেন কি রবীন্দ্রনাথ, বা সে সমস্যার গভীরে কখনও প্রবেশ করেছেন তিনি? 'শাসকশ্রেণীর প্রতি শাষিতদের ক্রোধ' বা 'সাম্রাজ্যবাদ-বিদ্বেষী' বলে 'মেঘ ও রৌদ্র'কে চিহ্নিত করা সমীচীন কি? এ গল্পের মূলসুর কি যথারীতি গ্রামীণ জনগণের অপবাদকীর্তন নয়? এ জনগণ নাকি সত্য-সাক্ষী হতে ভয় পায়, শাসকের অন্যায়কে মেনে নেওয়াই তাদের চারিত্র-ধর্ম, তাই মধ্যবিত্ত শশী বারবার শহরে চলে যেতে চায়, জেলকেই বেশী বাসযোগ্য মনে করে। গল্পটির আকর্ষণ-বিন্দু অবশ্য রাখা হয়েছে গিরিবালার বালিকাবেলা বিধবাবেলার প্রেম-কুহেলীতে। 'রাজটিকা'তেও এক অবাস্তব ব্যক্তিত্বের দোদুল চরিত্র নিয়ে কিছু মস্করা করা হয়েছে মাত্র।

'সামন্ততান্ত্রিক' হয়েও রবীন্দ্রনাথ যে 'সামন্ততন্ত্র-বিরোধী লক্ষণগুলি' দেখিয়েছেন তাঁর গল্পে, সে কেবল বৈচিত্র্য-পিয়াসী কবির কল্পনা-বিলাস আর পাশ্চাত্য-প্রেমবশে। ধনৈশ্বর্য তিনি কেবল যক্ষের মতো আঁকড়ে থাকেননি বটে, তবে 'গুপ্তধন' গল্পে অর্থাভাবের মূল প্রশ্নকে এড়িয়ে হাস্যকর যুক্তির এক কল্পলোক গড়ে অর্থনীতির চলতি ধারাটাকেই টিকিয়ে রাখার রায় দিয়েছেন। জমিদারী খরচে আপন পুত্র-জামাতাকেই বিদেশী-বিদ্যায় 'মানুষ' করে তুলেছেন। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা বিশ্বহিতায় হলেও, তা উঠে যাবার দুশ্চিন্তায় কবি মংপুতে বসে বলে উঠছেন, রথীরা তাহলে বাঁচবে কী নিয়ে? 'যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ' বা 'উলুখড়ের বিপদ' লিখলেও নিজের জমিদারীকে

সযত্নে রক্ষা করার যুক্তি হিসাবে বলেছেন—জমিদার না থাকলে তার বিকল্পে যারা আসবে, তারা যে আরও ভয়ঙ্কর। তাই নাকি তাঁকে নিরুপায় হয়ে পরগাছা-জীবন ধরে রাখতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ মূর্তিপূজার বৈদিকমন্ত্র অপছন্দ করেছেন, তাই বিকল্পে পূজা-বিষয়ক ব্রাহ্ম সঙ্গীত বেঁধে ছড়িয়ে দিয়েছেন। সামন্ততন্ত্রে নারীর অনুদার অবস্থানে বিরূপতা দেখিয়ে বিলেতী ঢঙে 'স্ত্রীর পত্রে' একক নারী-বিক্ষোভের বন্ধ্যা ছবি এঁকেছেন, যেখানে ক্ষুব্ধ মৃণাল সুদীর্ঘ চিঠি লেখে রাবীন্দ্রিক অলঙ্কারে জটিল এক মল্লকচ্ছ ভাষায়। উপসংহারে মৃণাল মীরাবাঈয়ের আদর্শে বেঁচে থাকার ইঙ্গিত রাখে। বুঝতে কষ্ট হয় না যে, সে হয়তো বাঈজীর জীবন নিয়ে কাল কাটাবে, নয়তো লম্বা চিঠির টানে স্বামীকেই করবে ঘরের বার, এবং শেষ অবধি একাকার হয়ে যাবে পুনর্মিলনে, যখন সংসারে তার খবরদারি প্রতিষ্ঠিত হবে, বিন্দু পাবে শক্ত আশ্রয়, গরু-বাছুরে যথাসময় খাবার পাবে, আর ধনবান স্বামীর উৎসাহে আয়েসী মৃণাল মনের সুখে কাঁড়ি কাঁড়ি কবিতা লিখে নাম করবে। অর্থাৎ সমাজটা যেখানে ছিলো, একটু ঝাড়পোছের পর সেখানেই তাকে আরও দৃঢ়তর প্রতিষ্ঠা দেওয়াই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য। তাঁর বিরোধিতা হলো **Her Majesty's Opposition,** যে কারণে ম্যানিফেস্টোর ভাষা উদ্ধৃত করে বলা যায়—**A part of the bourgeoisie is desirous of redressing social grievances in order to secure the continued existence of bourgeois society ;** নিষ্ক্রিয় বিচারে ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথ যদি বুর্জোয়া না হয়ে সামন্ততান্ত্রিক লেখকই হন, তবে এই উদ্ধৃতিটির বুর্জোয়া-আদি শব্দের স্থলে সামন্ততন্ত্রী-জাতীয় শব্দ বসিয়ে নিলেই চলে। 'বিপাকে পড়া'র কোনো আশঙ্কাই দেখি নে। নমস্কার।

ভবদীয়
নির্মল সাহা,
বার্তা-সম্পাদক 'অভিনয়'
কলকাতা-২৬,

পুনশ্চ :

যেটা প্রথমেই বলার ইচ্ছে ছিলো, সেটা হলো—

মাও-সে তুঙের হস্তাক্ষর ও কবিতা, নজরুলের আত্মসম্মানবোধে ভাস্বর পত্রখানিই আমাকে 'বিভাবে'র ক্রেতা-পাঠক করে তুলেছিলো ; get-upটা

তার আগেই অবশ্য দৃষ্টি কেড়েছিলো। পত্রিকার দীর্ঘজীবন কামনা করি। আমার পত্রটি পত্রিকাস্থ না করলে ক্ষতি নেই। অন্তত প্রবন্ধকারের মতামতটা জানার ইচ্ছে রইলো শুধু।

নিত্যপ্রিয় ঘোষের উত্তর

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প বিষয়ে পত্রলেখকের যেসব মন্তব্য প্রাসঙ্গিক সেগুলো হলো এই :

(১) "একটি আষাঢ়ে গল্প" একটি রূপক। এই রূপকের আড়ালে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় স্থবিরতার মাঝে বিদেশিরা (সম্ভবত সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা) প্রাণবন্যা কী ভাবে এনেছে, তাই দেখাচ্ছেন।

(২) 'শাস্তি' গল্পে অসহায়তা ফুটেছে, ক্রোধের যোগফলে যে সামাজিক বিপ্লব তার নিন্দায় রবীন্দ্রনাথ পঞ্চমুখ।

(৩) 'একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প'তে রবীন্দ্রনাথ কাঠঠোকরা—কাঁদা-খোচার রূপকের আড়ালে বঞ্চিত অন্নহীনদের সম্পর্কে অশালীন ব্যঙ্গ করেছেন।

(৪) বিত্তহীনদের গল্পের কেন্দ্রে রাখতে বা তাদের সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে রবীন্দ্রনাথ অপারগ হয়েছেন।

(৫) 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে রবীন্দ্রনাথ গ্রামীণ জনগণের অপবাদকীর্তন করেছেন।

(৬) 'রাজটিকা' এক অবাস্তব ব্যক্তিত্বের দোদুল চিত্র।

(৭) রবীন্দ্রনাথের সামন্ততান্ত্রিকবিরোধী লক্ষণগুলো বৈচিত্র্যপিয়াসী কবির কল্পনাবিলাস এবং পাশ্চাত্ত্য প্রেমের উদাহরণ।

(৮) 'গুপ্তধন' গল্পে রবীন্দ্রনাথ অর্থাভাবের মূল প্রশ্ন এড়িয়ে হাস্যকর যুক্তির কল্পলোক গড়ে অর্থনীতির চলতি ধারাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন।

(৯) সামন্ততান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে লিখে রবীন্দ্রনাথ সামন্ততান্ত্রিকতাই বজায় রাখতে চেয়েছেন, যা সাধারণ সংস্কারকদের লক্ষ্য : সংস্কার, বিপ্লব নয়।

(১০) 'স্ত্রীর পত্র' নারীবিক্ষোভের বন্ধ্যা ছবি।

* * *

(১) 'একটি আষাঢ়ে গল্প'-তে রবীন্দ্রনাথ যে-রূপকের ব্যবহার করেছেন, সেই রূপক আহৃত হয়েছে বাঙলার প্রচলিত রূপকথা থেকে। এই একই রূপক রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন 'একটি আষাঢ়ে গল্প' (১৮৯২) গল্পে, 'রাজপুত্র' (১৯৩১, পরিশেষ) কবিতায় এবং তাসের দেশ (১৯৩৩) নাটিকাতে। তিনটি রচনারই মূল সুর স্থবিরতা ও গতির সংঘর্ষে গতির জয়লাভ, প্রাচীন ও জীবনের দ্বন্দ্বে জীবনের অগ্রগতি। যে বিদেশি'র কথা বলা হচ্ছে, সে হয়তো 'সমুদ্রপারের কোন্ অভিনব যৌবনের বাণী,' হয়তো ইয়োরোপের অনুষঙ্গ আছে এতে। একথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ইতিহাস প্রণেতারা তৎকালীন ভারতবর্ষকে স্থবির, অচল, সংস্কারাচ্ছন্ন বলে মনে করছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ সেই ইতিহাস গ্রহণ করেছিলেন। এই ইতিহাসব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ নিজের তৈরি ব্যাখ্যা নয়, তৎকালীন ইতিহাসবিদ্দের সমর্থন।

এই রাজপুত্রটি ধরা যাক বিদেশি ইংরেজদেরই রূপক। ইংরেজসভ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। ইয়োরোপ এবং ইংল্যাণ্ডের কর্মনিষ্ঠা, ও বিজ্ঞানপ্রীতি রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল, তার পরজাতিশাসন লোলুপতা কখনো করে নি। তাই 'একটি আষাঢ়ে গল্প'তে পত্রলেখক যে ইঙ্গিত করেছেন (রবীন্দ্রনাথ ইংরেজশাসন সমর্থন করছেন) তা গ্রহণযোগ্য নয়। এবিষয়ে স্মরণযোগ্য, রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৩ সালে 'তাসের দেশ' উৎসর্গ করেছিলেন প্রবল ইংরেজবিদ্বেষী সুভাষচন্দ্র বসুকে।

গতি, প্রাণচাঞ্চল্য, পরিবর্তন এগুলো সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে বুর্জোয়া সমাজের আন্দোলনের লক্ষণ। 'একটি আষাঢ়ে গল্প' তাই রবীন্দ্রনাথের সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতার বিরোধিতার পরিচয় দেয়।

(২) 'শাস্তি' গল্পে অসহায়তা ফুটেছে, ক্রোধ ফোটে নি, একথা ঠিক। কিন্তু ক্রোধের যোগফলে যে সামাজিক বিপ্লব তার নিন্দায় রবীন্দ্রনাথ কোথায় পঞ্চমুখ! পত্রলেখক যদি সন্ধান দেন, তাহলে খুবই কাজের কাজ হবে। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় সামাজিক বিপ্লব বিষয়ে এই পঞ্চমুখতা দেখান দরকার হবে। রাশিয়ার চিঠিতে সোভিয়েট সরকার সম্পর্কে যেসব প্রতিকূল মন্তব্য আছে, তা না তোলাই ভালো, শুধু এইজন্যে যে সোভিয়েট সরকারের সর্ববিষয়ে আচরণ শতকরা একশো ভাগ সমর্থন কেউই করবেন না; লেনিন নিজেই তাঁর সরকারের রীতিনীতি বারংবার পালটিয়েছেন। এইসব ক্ষেত্রে পাঠকের

প্রয়োজন, রচনাটির মূল সুরটি কী তা অনুধাবন করা। 'রাশিয়ার চিঠি'র মূল সুর রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েট-সহানুভূতি, যেজন্যে ভারতবর্ষের ইংরেজ সরকার রাশিয়ার চিঠি-র ইংরেজি তর্জমা প্রচারিত হতে দেয় নি, রাশিয়া সফরের পর আমেরিকা সফরের সময় প্রাতিষ্ঠানিক আমেরিকার ক্রুদ্ধ ব্যবহার, প্ররোচনা সত্ত্বেও সেখানে রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া-নিন্দা হতে নিবৃত্তি এবং সর্বোপরি, রাশিয়ার চিঠি সম্পর্কে সোভিয়েট সরকারের সমর্থন ও সহানুভূতিশীল প্রচার।

(৩) 'একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প' রবীন্দ্রনাথের একটি অত্যন্ত তিক্ত গল্প সন্দেহ নেই। কিন্তু কাঠঠোকরা এবং কাঁদাখোচা কেবল 'ক্ষুধিত অসন্তুষ্ট মূক পক্ষী' বলেই বঞ্চিত অন্নহীনদের রূপক একথা ভাবার যথেষ্ট যুক্তি নেই। এই দুটি পাখির দুর্ভাগ্য, যেখানে খাদ্য নেই সেখানে খাদ্যের সংগ্রহের চেষ্টা। পৃথিবী বিশাল এবং নবীন এই বোধ কোকিল শ্যামার আছে বলেই কি তারা প্রপীড়ক শাসকের অথবা পলায়নী প্রবৃত্তির শিল্পীর রূপক?

(৪) বিত্তহীনরা রবীন্দ্রনাথের গল্পে প্রধান বিষয় নয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। যে বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা নেই, সেই বিষয়ে গল্প না লিখে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধিমানের কাজই করেছেন।

(৫) 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পে রবীন্দ্রনাথ যে প্রসঙ্গে গ্রামীণ জনগণকে অপবাদ দিয়েছেন, তা ঐতিহাসিক সত্য বলেই তাঁর বাস্তববোধের পরিচয় দেয়। গ্রামীণ জনগণ যদি সাহসিকতার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ইংরেজবিরোধিতা করতে পারত, অথবা তাদের দিয়ে করানো যেত, তাহলে স্বাধীনতা অনেক ত্বরান্বিত হতো। বিদ্রোহী বিপ্লবী জনগণ যেখানে নেই, সেখানে তাদের বিপ্লবী করে দেখানো সাহিত্যিক ও সামাজিক অসততা।

(৬) 'রাজটিকা' ইংরেজিবিদ কংগ্রেসী পলিটিসিয়ানদের আক্রমণ করে তীব্র ব্যঙ্গ। একে অবাস্তব গল্প মনে করার কোন সংগত কারণ নেই।

(৭) রবীন্দ্রনাথের সামন্তবিরোধী লক্ষণগুলি পাশ্চাত্যপ্রেমের নিদর্শন না ভেবে ভাবা ভালো পাশ্চাত্য আদর্শে উদ্বুদ্ধ। কিন্তু দেশীয় বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত না থাকায় দুর্বল বুর্জোয়া লক্ষণাক্রান্ত।

(৮) 'গুপ্তধন' গল্প অর্থাভাবের গল্প নয়, কোনো যুক্তির অবতারণা এখানে ঘটে নি, অর্থনীতির কোনো ধারারই ইঙ্গিত এখানে নেই। মাটির নিচের স্বর্ণের চাইতে গোধূলির স্বর্ণের উপভোগ্যতা বেশি এটা বলা হয়েছে

এই কারণেই যে মাটির নিচের স্বর্ণের প্রলোভনে মৃত্যুঞ্জয় দিগ্বিদিক্‌জ্ঞানশূন্য হয়েছিল।

(৯) সংস্কারক এবং বিপ্লবীদের মধ্যে পার্থক্য হলো, সংস্কারকরা সমাজের মূল ত্রুটির সমালোচনা না করে গৌণ ত্রুটির সংস্কার করার চেষ্টা করেন, বিপ্লবীরা মূলে টান দেন। রবীন্দ্রনাথ যাবতীয় সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণার বিরুদ্ধ কথা বলে গেছেন। অতএব পত্রলেখক মার্কসের যে-উক্তির উল্লেখ করেছেন, তা খুব প্রাসঙ্গিক নয়।

(১০) 'স্ত্রীর পত্র' নারী বিক্ষোভের বন্ধ্যা ছবিই, কারণ বুর্জোয়া ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও পরিণাম সম্পর্কে উঠতি বুর্জোয়ার পক্ষে জানা সম্ভব নয়।

* * *

রবীন্দ্রনাথ সামন্ততান্ত্রিক যেহেতু তিনি জমিদার ছিলেন, এ-কথা বিবেচনা করার জন্য একটা কথা মনে রাখা দরকার। জমির মালিক হলেই জমিদার, কিন্তু জমিদার হলেই সামন্ততান্ত্রিক হতে হবে, এ-কথা মনে করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারিতে সমবায়প্রথা, ব্যাঙ্কিং, ট্রাক্টরের সাহায্যে চাষ, সমবায়-বিপণনপ্রথা, ইত্যাদির প্রচলন করেছিলেন; রাস্তাঘাট উন্নয়ন, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, আপোষের সালিশীর সাহায্যে মামলার নিষ্পত্তি করার প্রচেষ্টাও তাঁর জমিদারির বৈশিষ্ট্য। সামন্ততান্ত্রিক জমিদাররা জমির উৎপাদনশীলতা বাড়াতে চেষ্টা করেন না, জমিলব্ধ ঐশ্বর্য ব্যক্তিগত ভোগে ব্যয় করেন। রবীন্দ্রনাথের জমিদারি অনেকটাই ধনতান্ত্রিক জমিদারি ছিল।

রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতাকে সামন্ততান্ত্রিক আধ্যাত্মিকতা বলা যায় না। তাঁর ধর্মবোধের প্রধান লক্ষণ অহং সন্ধান, অহং-এর বিলুপ্তি নয়। এটাও বুর্জোয়া ব্যক্তিত্বের সন্ধান। ধর্ম নিয়ে মগ্ন থাকলেই তা সামন্ততান্ত্রিকতা নয়, সেই ধর্মের চরিত্র কী সেটাই বড়ো কথা।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প বিষয়ে পত্রলেখকের আপত্তির প্রধান প্রধান কারণ এগুলোই ছিল।

সবিনয় নিবেদন,

'বিভাব'-এর প্রথম সংকলনটিতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর একগুচ্ছ ক'রে কবিতা সত্যিই চমৎকার। তবে প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়ের আলোচনার সূত্র ধরে একজন পাঠক যত সহজে বুদ্ধদেবের কবিতার গভীরে চলে যেতে পারেন, 'সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা' শীর্ষক প্রণবেন্দু দাশগুপ্তর আলোচনা কিন্তু সেই অর্থে ঐ কবির কবিতাগুচ্ছের সহায়ক কিংবা পরিপূরক হ'য়ে উঠতে পারেনি। যদিও উদ্ধৃতি রয়েছে রবার্ট পেন ওয়ারেন থেকে, যদিও রোমান্টিকতার তুলনামূলক বিচারে এসে পড়েছে ওয়ল্ট হুইটম্যান প্রসঙ্গ, যদিও কবিতার ভেতরের ক্রোধ ও ঘৃণা উপলব্ধির বিষয়ে স্মরণ করতে বলা হয়েছে দান্তে ও ব্লেককে, আর এভাবেই সৃষ্টি হয়েছে এক অনুদ্ধারণীয় ধোঁয়াশার, যার ভেতর থেকে আলোচক শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে পারেননি। অবশ্যই এটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত ধারণা, এক-একজনের একেকরকম মনে হবে তাতে সন্দেহ কী!

আরো মর্মান্তিক যা, তা হ'লো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কিছু পুরানো বহুপঠিত কবিতার ভুল উদ্ধৃতি ব্যবহার। আলোচনার সুরুতেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের যে কবিতাটির প্রথম পংক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে, আলোচক জানিয়েছেন সেই কবিতাটির নাম নাকি তাঁর মনে নেই! অথচ আবার নিজেই স্বীকার করেছেন ১৯৫৫-৫৬ সালে 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ কবিতাটি 'আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিলো।' যা-ই হোক, আমরা জানি কবিতাটির নাম 'বিবৃতি'। এখন এই 'বিবৃতি'র প্রথম পংক্তিটি আলোচক তুলে দিয়েছেন এইভাবে—"উনিশে বিধবা হয়ে কায়ক্লেশে উনত্রিশে এসে'—আসলে কিন্তু হবে, 'উনিশে বিধবা মেয়ে কায়ক্লেশে উন্‌তিরিশে এসে'। মনে হয় তিনি স্মৃতিনির্ভর হ'য়ে এ-কাজটি করায় ত্রুটি থেকে গেছে। কিন্তু কবিতাটি যে-ছন্দে লেখা তাতে 'উনত্রিশে' এই ব্যবহার কান মেনে নেয় না, মূল কবিতায় তাই ভেঙে 'উন্‌তিরিশে' করা হয়েছে, সঙ্গত কারণেই। এরপর প্রণবেন্দুবাবু সংক্ষেপে মহিলাটির দুর্গতির কথা বিবৃত ক'রে কোটেশন মার্ক-এর মধ্যে ঐ কবিতারই যে লাইনটি তুলে দিয়েছেন সেটি আগাগোড়া ভুল। তাঁর উদ্ধৃতিতে আছে, 'বাঁচাতে পারবে না কোনো ভবিষ্যের বীরসিংহ শিশু'। আসলে এইরকম হবে: বাঁচাতে পারবে না তাকে উনবিংশ শতাব্দীর বীরসিংহ শিশু'। (দ্রষ্টব্য: সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্য সংগ্রহ, বিশ্ববাণী সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৬)।

এরপর প্রণবেন্দুবাবু লিখেছেন, "তার কিছুকাল পরে, সম্ভবত সুনীলই লিখেছিলেন, 'চার জোড়া লাথির ঘায়ে রবীন্দ্ররচনাবলী লুটোয় পাপোষে'।" আমার বিনীত জিজ্ঞাসা, 'সম্ভবত' কেন। আলোচক কি নিশ্চিত নন? তাছাড়া আমরা তো জানি চার জোড়া লাথির ঘায়ে নয়, 'তিন জোড়া লাথির ঘায়ে রবীন্দ্র রচনাবলী' পাপোশে লুটোচ্ছিলো। যদিও একজোড়া পায়ের কম বেশীতে রবীন্দ্রনাথের কিছু আসে যায় না!

এবার আরেকটি বিষয়ের ওপর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। 'শিল্প প্রদর্শনীতে' এই কবিতার যে ব্যাখ্যা প্রণবেন্দুবাবু করেছেন, তাও মেনে নিতে পারলাম না এই কারণে যে, ব্যাখ্যাটি ভুল। কবিতাটি প'ড়ে চমৎকার বোঝা যায় শিল্পী একটি কুৎসিত মূর্তি তৈরি করেছেন এবং একজন 'শাড়ী মোড়া জীবন্ত সুন্দর' নারী আছেন মূর্তিটির সামনে। টেবিলের পাশ থেকে শিল্পী এগিয়ে এলেন, এবং শিল্পীর সঙ্গে 'তৃতীয় ব্যক্তির দৌত্যে' নারীটির 'পরিচয় সাঙ্গ হলো'। শিল্পীর গোপন দীর্ঘশ্বাস ঐ জীবন্ত শিল্পকে, অর্থাৎ নারীটিকে ভেবে—'এইসব নারীদের অপর পুরুষে নিয়ে যায়।' এরপরেও শিল্পীর পৌরুষ সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ কোথায়! কিন্তু প্রণবেন্দুবাবু জানাচ্ছেন, "শিল্পীটি সুন্দরী, কিন্তু তাঁর তৈরি ভাস্কর্য হলো 'একটি কুৎসিত মূর্তি…'।" এরপরে তিনি আরও জানাচ্ছেন, 'শিল্পীকে সুন্দরী করার মধ্যেও সুনীলের নারীবন্দনাজনিত রোমান্টিকতা প্রকাশিত হয়েছে।' অথচ সুন্দর ছিমছাম এই কবিতাটিতে সমগ্র বিষয়টি এত পরিষ্কার যে অন্যরকম ধারণা জাগা কোনমতেই সম্ভব নয়।

অলমিতি

দেবাশিস বসু

[চিঠিপত্রে প্রকাশিত কোনো মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন]

BIVAV
Special Combined Number : October-December 1976
and January-March 1977
Price Rs. 2.00
Vol. I. Number 2 and 3 Declaration No. 35/76

For efficient and prompt lighterage services

Please Contact

PORT SHIPPING COMPANY LTD.

5, SYNAGOGUE STREET
CALCUTTA-700001

Gram : CARGOHAND Phone : 22-8906-9